দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

'দ্য কেরালা স্টোরি' নিষিদ্ধ করে মুখ্যমন্ত্রী ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদেরই প্রেরণা জোগালেন— পৃঃ ২৮

পারিবারিক এক স্বজনোৎসব জামাইষষ্ঠী — পৃঃ ১৫

৭৫ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা।। ২২ মে, ২০২৩।। ৭ জ্যৈষ্ঠ - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

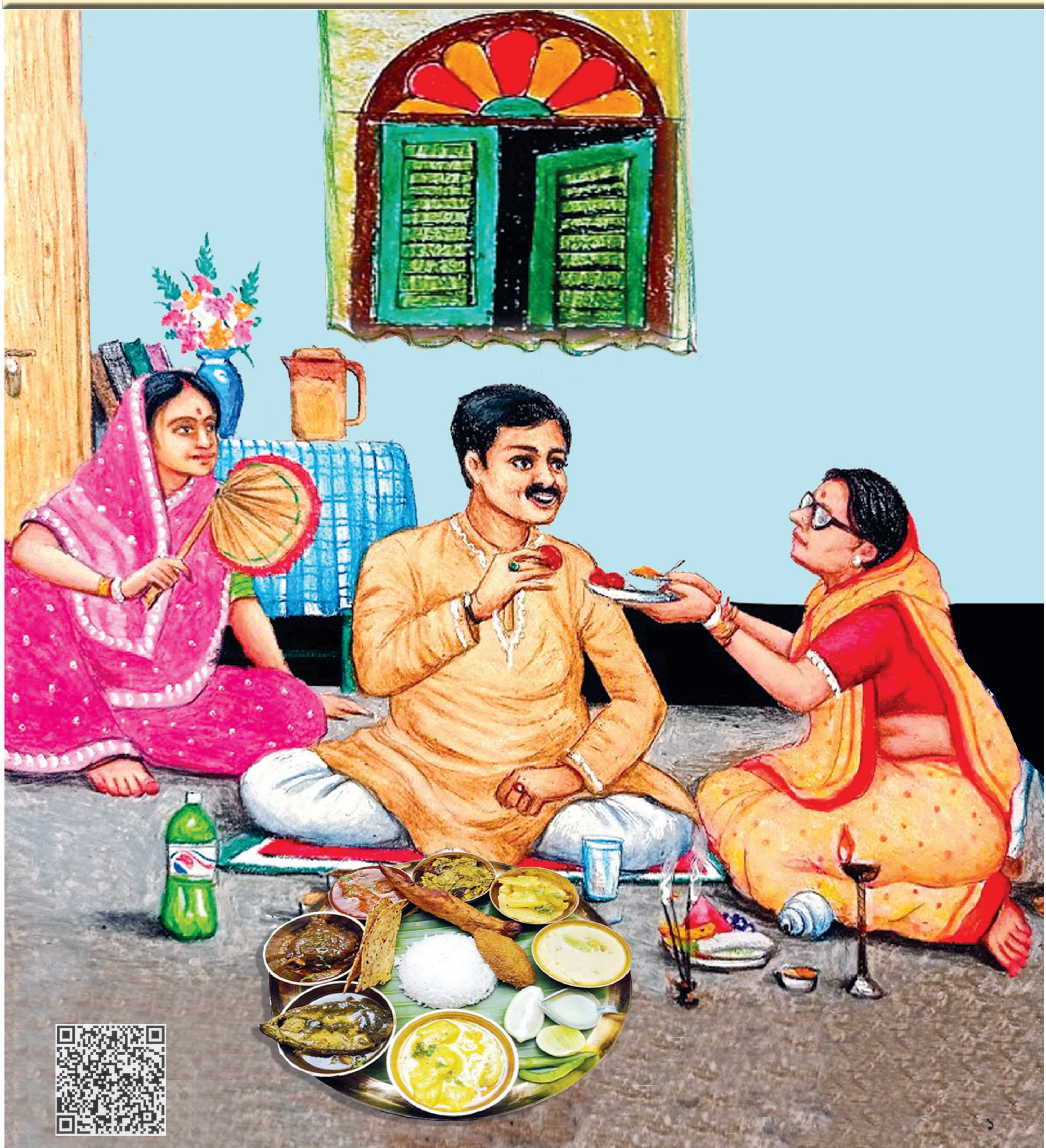

CENTURYPLY®

CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা, ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

২২ মে - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

উলঙ্গ রাজা, তোর কাপড় কোথায়? ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

বকেয়া ডিএ থেকে কমিশন মেলে না, তাই হবে না ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক দুটি রায় থেকে বিজেপির শিক্ষা নেওয়া উচিত ◻ আর জগন্নাথন ◻ ৮

কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে মুসলমান-ভোট ও কংগ্রেসের জয়ের পর ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ স্লোগান ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

বিজেপি সমর্থক রাজবংশীরা কি রাজবংশী নয়? ◻ সাধন কুমার পাল ◻ ১১

জামাইষষ্ঠী এখন বাঙ্গালির সংস্কৃতির অঙ্গ ◻ ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ১৩

পারিবারিক এক স্বজনোৎসব ‘জামাইষষ্ঠী’ ◻ আশিস কুমার বৈদ্য ◻ ১৫

লোকায়ত পরম্পরার উৎসব জামাইষষ্ঠী ◻ সুতপা বসাক ভড় ◻ ১৭

দ্য কেরালা স্টোরি নির্জলা সত্য ঘটনা ◻ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ◻ ২৩

দূষিত মানসিকতা দ্য কেরালা স্টোরিকে নিষিদ্ধ করেছে ◻ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ২৭

দ্য কেরালা স্টোরিকে নিষিদ্ধ করে মুখ্যমন্ত্রী ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদেরই প্রেরণা জোগালেন ◻ মন্দার গোস্বামী ◻ ২৮

পাতঞ্জল দর্শনে আত্মচৈতন্য নির্মাণপথ ◻ অমিত ঘোষ দস্তিদার ◻ ৩১

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বিজ্ঞান সাধনা ও দর্শনতত্ত্ব ◻ দীপক খাঁ ◻ ৩৪

জামাইষষ্ঠী মানেই বাঙ্গলার বাজারে আমের বৈচিত্র্য ◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ৩৫

কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার উৎস ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত ◻ ড. জয়ন্ত কুশারী ◻ ৪৩

বিশ্বভারতী ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তকমা পেলে তা হলো অত্যন্ত গর্বের বিষয় ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ৪৫

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ৩০ ◻ অন্যরকম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৯ ◻ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে
২৯ মে ২০২৩

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
২৯ মে ২০২৩

হিন্দু হৃদয় সম্রাট ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ

মাঝে মাঝে এমন একেকজন জন্মান যাঁর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয় সারা দেশ। রাণাপ্রতাপ ছিলেন এমনই একজন ব্যক্তিত্ব। কিন্তু যিনি না জন্মালে ভারতবর্ষের হিন্দুরা কোনোদিনই বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে পারত না, তিনি হলেন শিবাজী মহারাজ। মুঘল সম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ ছিলেন শিবাজী। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে শিবাজীর জীবন ও কর্ম সম্বন্ধীয় একাধিক আলোচনা। উঠে আসবে নানা অজানা তথ্য। লিখবেন বিশিষ্ট লেখকরা।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। এটি এক ধরনের অনুদান মাত্র। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693

IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বৃক্ষবন্দনাই জামাইষষ্ঠী

বাঙ্গালির বারোমাসে তেরো উৎসব। উৎসবের মধ্যেই তাহারা বাঁচিয়া রহিয়াছে। তাই বাঙ্গালি উৎসবপ্রিয় জাতি নামে পরিচিত হইয়াছে। মানুষ শুধু খাইয়া-পরিবার জন্যই বাঁচিয়া থাকে না। তাহার মহৎ উদ্দেশ্য রহিয়াছে। তাহার জন্য সামাজিক দায়িত্ব পালন করিতে হয়। সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ রাখিবার জন্য আনন্দ উৎসবের আয়োজন করিতে হয়। জীবনের সার্থকতা শুধুমাত্র নিজেকে লইয়া হয় না। বহুর সহিত মনের মিলনেই জীবনের সার্থকতা অনুভূত হয়। সুখ-দুঃখের রোজনামচায় বারো মাসে তেরো উৎসব জীবনে বহিয়া আনে আনন্দের হিল্লোল। প্রতি জ্যৈষ্ঠ মাসে বহিয়া আনে তেমনই একটি উৎসব—জামাইষষ্ঠী। পিতৃগৃহে কন্যা-জামাতাকে লইয়া লোকায়ত উৎসব। কন্যা-জামাতার উপস্থিতিতে পরিবারে পরিবারে আনন্দের বান ডাকিয়া যায়। ইদানীংকালে এই উৎসব জামাইষষ্ঠী নামে পরিচিত হইলেও আদতে ইহার নাম অরণ্যষষ্ঠী। প্রকৃত লক্ষ্য গৌণ হইয়া এখন জামাতাকে উপলক্ষ্য করিয়া ভুরিভোজই লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে। কোন অজ্ঞাত কারণে বাঙ্গালি ক্রমেই উৎসবের মূল লক্ষ্যকে কেন উপেক্ষা করিতে শুরু করিয়াছে তাহা কে জানে! তবে ইহা সুখের কথা নহে।

জামাইষষ্ঠী আদতে অরণ্যষষ্ঠী। অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রতীকস্বরূপ কোনো বৃক্ষকে পূজা করিয়া পারিবার পরিজনের মঙ্গল কামনা করিবার দিন। এইদিন গ্রামের অভ্যন্তরে অথবা বাহিরে কোনো প্রাচীন বৃক্ষকে গ্রামের মাতৃমণ্ডলী তাহাদের শিশুপুত্র-কন্যা, বিবাহিতা কন্যা ও জামাতাকে সঙ্গে লইয়া মা ষষ্ঠীর পূজা করিয়া থাকেন। ওই বৃক্ষকে সিঁদুর মাখাইয়া, পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া, হলুদ সূত্রে বেষ্টন করিয়া, অবশিষ্ট পরিবার পরিজনদের হাতে বাঁধিয়া দিয়া মা ষষ্ঠীর নিকট নীরোগ ও দীর্ঘজীবনের কামনা করিয়া থাকেন। এই দিনটিকে বৃক্ষবন্দনা অথবা বনমহোৎসবও বলা যাইতে পারে। লক্ষণীয় যে, বনসৃজনের সচেতনতায় ভারত সরকারও ১৯৫০ সালে জুলাই মাসকে বনমহোৎসবের মাস ঘোষণা করিয়া বনসৃজনে উৎসাহ দান করিয়াছে। কিন্তু ইহার বহু পূর্ব হইতেই গ্রামবাঙ্গলার মানুষ জ্যৈষ্ঠের প্রথম বর্ষণের পর স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বৃক্ষরোপণ করিয়া থাকেন এবং সংবৎসর তাহার পরিচর্যা করিয়া থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো জেলায় অরণ্যষষ্ঠীর দিন গ্রামের মাতৃমণ্ডলী একত্রিত হইয়া কোনো একটি বৃক্ষকে সন্তানরূপে, জামাতারূপে অথবা দেবতারূপে পূজা করিয়া বৃক্ষবন্দনা করিয়া থাকেন। বৃক্ষছেদন নয়, বৃক্ষরোপণ এবং তাহার সংরক্ষণের বার্তাবহ হইল অরণ্যষষ্ঠী। অরণ্যকে বাঁচাইয়া রাখিবার তাগিদেই কোন সুদূর অতীতে হয়তো শুরু করা হইয়াছিল এই লোকায়ত উৎসবটির।

একটি গাছ একটি প্রাণ — এই বোধ প্রাচীন আরণ্যক সভ্যতার ধাত্রীভূমি ভারতবর্ষ সেই অনাদি অতীতেই অনুভব করিয়াছিল। অরণ্যষষ্ঠী তাহারই সাক্ষ্য বহন করিয়া চলিতেছে। ভারতবর্ষের ঋষিরা জানিতেন, মানুষের প্রাণবায়ুর উৎস হইল বৃক্ষ। তাই বৃক্ষ অথবা অরণ্যকে দেবতা ও দেবীজ্ঞানে পূজা করিবার চল রহিয়াছে এই দেশে। প্রকৃতির সহিত নিবিড় বন্ধনেই গড়িয়া উঠিয়াছিল সনাতন সভ্যতা। তাই উৎসব বা লোকাচারগুলির নেপথ্যে রহিয়াছে প্রকৃতির আরাধনা। আরণ্যক সভ্যতার ধ্বংসলীলা দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার প্রকৃতি বন্দনায় লিখিয়াছেন, ‘দাও ফিরে সে অরণ্য’। মানব সভ্যতাকে নির্বিঘ্ন করিবার জন্য জামাইষষ্ঠীকে শুধুমাত্র ভুরিভোজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া বনসৃজন ও সংরক্ষণের সচেতনতাও অতি জরুরি। আর তাহা হইলেই উৎসবটি প্রকৃত রূপ প্রাপ্ত হইয়া সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিবে।

সুভাষিতম্

বায়ূনাং শোধকাঃ বৃক্ষাঃ রোগণামপহারকাঃ।

তস্মাদ্ রোপণমেতেষাং রক্ষণং চ হিতাবহম্।।

বৃক্ষ বাতাস শুদ্ধ করে এবং বিভিন্ন রোগ দূরীভুত করে। এজন্য বৃক্ষ রোপণ ও রক্ষণ প্রাণীমাত্রেই হিতকারী।

উলঙ্গ রাজা, তোর কাপড় কোথায়?

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

হাততালি দিতে দিতে সরল আর নির্ভীক শিশুটি রাজাকে বলেছিল 'রাজা তুই উলঙ্গ। পরনে তোর কোনো কাপড় নেই। তোর সে হুঁশটাও নেই।' স্তাবকদের তা না বলতে পারার কথা। এই রাজ্যেও সে অবস্থা। তবে এখানে রাজার রূপে যুবরাজ আছেন। এখনো তার রাজ্যাভিষেক হয়নি। দুর্নীতিতে জড়িয়ে হবু রাজার অবস্থা রাজা বুঝতে পারছেন তবে মানতে পারছেন না। সিংহাসনের বদলে জেলের গরাদের চিত্রটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। শাসক তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষের সামনে বসিয়ে জেরা করার নিদান হেঁকেছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সিবিআই বা ইডিকে বহুবার কাঁচকলা দেখিয়েছেন অভিষেকবাবু।

জনগণকে বুঝিয়েছিলেন তদন্ত সংস্থা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কেন-বা তা করবে? সেটা তাদের কাজ নয়। মিথ্যা আস্ফালন করে জানিয়েছিলেন দুর্নীতি প্রমাণ হলে ফাঁসিতে ঝুলে পড়বেন। দুর্নীতির কারণে এ দেশে ফাঁসির কোনো আইন বা নিয়ম নেই। আদালতের নির্দেশের পরেই অভিষেকের হৃদকম্প শুরু হয়ে গিয়েছে। নির্দেশের উপর দু'বার নিষেধাজ্ঞা চেয়েছেন। অভিষেকের দেখানো কাঁচকলা তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছে মাহামান্য আদালত। তার সব আবেদন নাকচ হয়ে গিয়েছে। কবিতার রাজা দু'কান কাটা ছিলেন কিনা আমি জানি না। তবে বিষয়ের রাজা নির্ভীকভাবে নির্লজ্জ। তার দু'কান কাটা। বেহায়া। স্তাবককুল মানতে নারাজ তাদের রাজা উলঙ্গ। অভিষেকবাবুর রক্ষাকবচ তুলে দিয়ে আদালত প্রমাণ করে দিয়েছেন দুর্নীতির তদন্তে কাউকে রেয়াত করা হবে না। সে রাজা হোক বা মহারানি। চাকরিতে ৩৬ হাজার বেআইনি নিয়োগ ইতিমধ্যেই খারিজ হয়েছে।

শোনা যাচ্ছে প্রভাবশালী মন্ত্রী আর অভিষেকবাবুর ঘনিষ্ঠ মলয় ঘটক নাকি তদন্তকারী সংস্থার নোটিশ পেয়েছেন। ন'বার জেরা এড়িয়েছেন মলয়বাবু। তাকে দিল্লিতে হাজিরা দিতে চলেছে আদালত। শিশুটির শাস্তি হয়েছিল কি না মনে নেই। এ রাজ্যে অমনি ধারা হলে শিশু বা বৃদ্ধ কেউ বেঁচে থাকত না। কয়েকদিন হলো জনসংযোগ যাত্রা শুরু করেছেন অভিষেক। পঞ্চায়েত ভোটকে সামনে রেখেই এই যাত্রা। মাত্র দু'বছর আগে গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ জিতেছিল তৃণমূল। তাহলে নতুন করে জনসংযোগের প্রয়োজন পড়ল কেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো অভিষেকবাবুকে দিয়ে তাঁর জনপ্রিয়তার জল মাপানোর কাজ শুরু করেছেন।

ইতিমধ্যে জানিয়েও দিয়েছেন তাঁকে দিয়ে তৃণমূল শেষ হয়ে যাবে না। কারণ উত্তরাধিকার তৈরি হচ্ছে। তবে এটা বোঝা দুষ্কর কীসের বা কার উত্তরাধিকার? তবে মানুষ বলছেন দুর্নীতি চালিয়ে যাওয়ার উত্তরাধিকার তৈরি করতে চাইছেন মমতা। আমার ধারণা সে সুযোগ তিনি পাবেন না। বিজেপি কর্ণাটকের ভোটে হেরে যাওয়ায় মমতা খানিকটা অক্সিজেন পেয়েছেন। মমতা বলেছেন বিজেপির শেষের শুরু হয়েছে। আমি সহমত নয়। তাছাড়া বেল পাকলে কাকের কী? গলার জোরে মমতা দাবি করলেও তৃণমূল আর জাতীয় দল নয়। ফলে মমতার জাতীয় প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে গিয়েছে। এটা মনে রাখা দরকার, সারা দেশে বিজেপি মুক্ত পনেরো রাজ্য হলেও প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই বিজেপি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রয়েছে।

> **মানুষ বুঝে গিয়েছেন রাজার আসল ভয়টা তার দুর্নীতিতে উলঙ্গ হওয়া। রাজা জানেন তিনি নগ্ন। পরনে কাপড় নেই। দুর্নীতির টানে সে কাপড় খুলে গিয়েছে।**

ফলে ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে বিজেপির জয় প্রায় অবশ্যম্ভাবী। এই পনেরো রাজ্যের মধ্যে কংগ্রেস শাসিত মাত্র চারটি। জাতীয় ক্ষেত্রে বিজেপি আর নরেন্দ্র মোদী বিরোধী জোটের কাণ্ডারিদের মধ্যে মমতা নেই। তাছাড়া কর্ণাটক ভোটে কংগ্রেস জিতেছে। মমতাকে তারা বিশ্বাসঘাতক আর ভোট কাটুয়া বলেই মনে করে। কর্ণাটকের ফল পর্যালোচনা করে জানা গিয়েছে, সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষ ভোট দিয়েছে। ঠিক একভাবে মমতার দল আর সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যের মানুষ এখানে রুখে দাঁড়াবেন। রাজার সাজপোশাক আর আদব কায়দার বহর দেখে স্তাবকের দল বাহবা আর হাততালি দিচ্ছে। আদালত কিন্তু প্রশ্ন তুলেছে রাজা কেন তদন্ত এড়াতে চাইছেন? তিনি যদি চোর বা দুর্নীতিবাজ না হন তাহলে ভয়টা কোথায়? মানুষ বুঝে গিয়েছেন রাজার আসল ভয়টা তার দুর্নীতিতে উলঙ্গ হওয়া। রাজা জানেন তিনি নগ্ন। পরনে কাপড় নেই। দুর্নীতির টানে সে কাপড় খুলে গিয়েছে। রাজ্যের মানুষ তাই জানতে চাইছে 'উলঙ্গ রাজা! তোর কাপড় কোথায়'? □

বকেয়া ডিএ থেকে কমিশন মেলে না
তাই হবে না

গরিবেষু দিদি,

আপনার ভালোবাসার মূল্য দিতে জানে না কেউ। সত্যিই দিদি। আমার খুবই খারাপ লাগে। রাজ্যের কাছে পর্যাপ্ত টাকা থাকলে ভালোবেসেই আপনি বর্ধিত মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) দিতেন বলে জানিয়েছেন। একই সঙ্গে বলেছেন, ডিএ 'বাধ্যতামূলক' নয়, 'ঐচ্ছিক'। আদালত অধিকার বলে দিলেও আপনার চোখে বিষয়টা কুকুরের মতো 'ঘেউ ঘেউ'। ঠিকই তো। কেন এমন দাও দাও করবে। জানেন দিদি, আপনিও যখন হিসেব না দিয়ে কেন্দ্রের কাছে টাকা দাও, বকেয়া দাও বলেন তখনও অনেকে এমনটাই মনে করে। তবে নরেন্দ্র মোদীর আপনার মতো করে 'ঘেউ ঘেউ' বলার ক্ষমতা নেই। কেউ হয়তো বলবে প্রধানমন্ত্রীর এমন 'রুচি' নেই, কিন্তু আমি বলব, 'ক্ষমতা' নেই। এমন করে সরকারি কর্মচারীদের ছোটো করার জন্য ক্ষমতা লাগে, বিশেষ শিক্ষা লাগে। সেটা মোদীর নেই।

এ সব কথা অতীতেও আপনি বলেছেন। তবে এবার আরও কড়া ভাষায় কেন্দ্রীয় সরকারের হারে ডিএ-র দাবিদারদের বলছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি খুঁজে নিন না, তাহলে আরও বেশি বেতন পাবেন, আরও বেশি ডিএ পাবেন। আমাদের রাজ্য সরকারের চাকরিতে যখন ঢুকেছেন, তখন এখানে যা নিয়মকানুন রয়েছে সেই মতো করছি।' এটা ন্যায্য কথা। 'অপরে অধম হইলে আমি উত্তম হইব না কেন' যদি সত্য হয় তবে 'অপরে উত্তম হইলে আমি অধম হইব না কেন' এটাও সত্য। কিন্তু দিদি, আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে। সেটা হলো, রাজ্যের শিক্ষক, অধ্যাপকরাও তো রাজ্য সরকারের বেতনভুক। তাঁরাও বর্ধিত হারে ডিএ চান। তাহলেও তাঁদের এই ভাবে অপমান করাটা কি ঠিক কাজ? আপনি যখন বলেছেন তখন নিশ্চয়ই ঠিক, কিন্তু তবু বলছি, ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা কমে যায় না কি! সেটা অবশ্য আপনি ভালো বুঝবেন। তাছাড়া চাকরি কেনা শিক্ষকদের প্রতি আর কার সম্মান রয়েছে? আমি তো মনে করি, যাঁরা চাকরি বিক্রি করে কোটি কোটি কামিয়েছেন তাঁদের চেয়েও বেশি দোষ চাকরি ক্রেতাদের। আসলে রাজ্যে চাকরিবাকরির হাল এতটাই খারাপ যে নিরাপত্তা রয়েছে এমন চাকরি বলতে বেঁচে রয়েছে শুধুই স্কুল শিক্ষকতা। কলেজে তো আজকাল আর নিয়োগই হয় না। উপাচার্যরাও তো সব 'সিভিক'। এবার সেমি ডাক্তার, ডিপ্লোমা ডাক্তার, এমনকী সিভিক পুলিশের ব্যবস্থাও আপনি করে ফেলেছেন। এখন যাঁরা আপনার মূল্যায়ন করতে পারছেন না তাঁরা একদিন ঠিক বুঝবেন। তখন ইতিহাসে লেখা থাকবে আপনার নাম। হয়তো তুঘলকের সঙ্গে তুলনা হবে তবুও তো থাকবে। আপনি আমাকে সুযোগ দিলে আমি সরাসরি বলে দিতাম, 'আমরা সবেতে কমিশন চাই। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ দিয়ে দিলে পার্টি কিছু পাবে কি? আমরা বাবা মার সৎকার করার সমব্যথী প্রকল্পের ২ হাজার টাকা থেকেও কাটমানি নিই, কিন্তু এখানে তো কোটি কোটি টাকার ব্যাপার। আমাদের লোকেরা কী করেকম্মে খেতে পারবে? যদি না হয়, তবে দেব না। ডিএ দেব না। যে যা পারিস করে নে। মোদীর কাছে গিয়ে চাকরি করগে যা। সেই সব শূন্য পদের চাকরি আমরা কোটি কোটি টাকায় বিক্রি করে কামাই বাড়াব।' বলব দিদি, বলব। একটি বার আমায় সুযোগটা দিয়েই দেখুন না।

কেউ কিছু করে ফেলবে বলে যেটা বললেন, সেটা কেন? কেউ কিছু করে ফেললে কি আমাদের পার্টির বা সরকারের সুবিধা হবে? এটা কী একটা সম্ভাবনা তৈরি করে দেওয়া? আপনার কথায় আবার কেউ কিছু করে বসবে না তো!

দিদি আপনি আর একটা কথা বলে আমার মন জিতে নিয়েছেন। চাকরি কিনে যাঁরা প্রাথমিকের শিক্ষক হয়েছিলেন তাঁদের সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন তার প্রশংসা না করে পারছি না। আদালত বলেছে ৩৬ হাজার প্রাথমিক শিক্ষককে যোগ্যতা ছাড়াই নিয়োগ করা হয়েছে। তার জন্য আদালতে লড়াই চলবে। ঠিকই রয়েছে। এটাই তো হওয়া উচিত। ভারতীয় গণতন্ত্রে যে কোনও নির্দেশকেই চ্যালেঞ্জ করার অধিকার দেওয়া রয়েছে।

আপনি মুখে না বললেও এমন আশঙ্কা করেছেন যে, কেউ যদি কিছু করে ফেলে। আপনি যখন মুখে বলেননি তখন আমিও বলব না। দিদি আপনি বলেছেন, 'আমার কাছে প্রচুর ছেলে-মেয়ে আসছেন, ফোন করছেন। যে ৩৬ হাজার শিক্ষককে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা আসছেন। একটা পবিারে ৬ জন থাকলে, ২ লক্ষ মানুষ হঠাৎ বিপদে। অনেকে অবসাদে ভুগছেন। সমস্যা হচ্ছে। সবাই আর্জি জানাচ্ছেন, আমাদের বাঁচান।' আপনি এটাও বলেছেন যে, 'আমার কাছে খবর আসছে, অনেকে অবসাদে ভুগছেন। কখন কে কী একটা ঘটিয়ে দেবেন, তখন কি আমরা রক্ষা করতে পারব? একটা মানুষের জীবনের দাম অনেক বেশি।'

দিদি, আমি না মানেটা ঠিক বুঝতে পারিনি। কেউ কিছু করে ফেলবে বলে যেটা বললেন, সেটা কেন? কেউ কিছু করে ফেললে কি আমাদের পার্টির বা সরকারের সুবিধা হবে? এটা কী একটা সম্ভাবনা তৈরি করে দেওয়া? আপনার কথায় আবার কেউ কিছু করে বসবে না তো!

ভয় করে দিদি। ভয় করে। □

অতিথি কলম

আর জগন্নাথন

সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক দু'টি রায় থেকে বিজেপির শিক্ষা নেওয়া উচিত

বিজেপিকে দ্বিতীয়বার ভাবতে হবে রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে যে তাঁকে যতদূর ক্ষমতাবৃত্তের মধ্যে রাখা যায়। আর যদি তারা দিল্লি সরকারের কাজকম্ম ন্যায়সঙ্গত না মনে করে সেক্ষেত্রে লোকসভায় যথাযথভাবে সংশোধিত আইন প্রণয়ন করাক। গভর্নর সর্বদা নিয়ামক হতে পারেন না।

মহারাষ্ট্র ও দিল্লিতে সাম্প্রতিক অতীতে উদ্ভূত দু'টি পরিস্থিতির ক্ষেত্রে রাজ্যপালেদের ভূমিকাকে প্রায় খারিজ করেছে সর্বোচ্চ আদালত। রাজ্য প্রশাসন ও রাজ্যপাল এই দুই পক্ষের মধ্যে কমনসেন্সের একান্ত অভাব এবং রাজ্যপালের দলীয় ভূমিকা অবলম্বনের মতো উক্তিও উঠে এসেছে।

এক্ষেত্রে দিল্লির আম আদমি পার্টি ও তৎকালীন মুম্বাইয়ের শিব সেনার উদ্ধবগোষ্ঠী বাস্তবিক নৈতিক জয় পেয়েছে। এই জয় পাওয়ার বিষয়টি এসেছে মহামান্য আদালতের একেবারে সর্বোচ্চ সংবিধানিক বেঞ্চের ঘোষণায়। তবে এটা এখনও জোর দিয়ে বলা যায় না যে এই রায় এই মুহূর্তেই দিল্লি মুম্বাইয়ের চলতি রাজনৈতিক অবস্থা বদলে দেবে। তবে, সর্বোচ্চ আদালতের এই রায় একেবারে প্রাঞ্জল করে দিয়েছে যে কোনো রাজ্যপালই খামখেয়ালিভাবে যেমন ঠিক করতে পারেন না কখন একটি রাজ্যে বিধানসভার ফ্লোরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ধারিত হবে, তেমনি একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের লেফটেন্যান্ট গভর্নরও সদাসর্বদা সেখানকার যাবতীয় প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। বিশেষ করে যেখানে একটি নির্বাচিত সরকার মজুত আছে।

প্রথম ক্ষেত্রে আপ তাদের অধীনস্থ কর্মীদের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব গভর্নরের হাতে থাকার সিদ্ধান্তকে সর্বোচ্চ আদালতে চ্যালেঞ্জ করে। মহামান্য আদালত ৫ বিচারকের একটি বেঞ্চ প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়কে মাথায় রেখে গঠন করে দেয়। এঁরা চূড়ান্ত রায়ে সাধারণ যুক্তরাষ্ট্রীয় রীতি অর্থাৎ ক্ষমতা ও দায়িত্ব একই সঙ্গে পালিত হওয়ার সহজ নিয়ম পালন করার নির্দেশই দেন। এক্ষেত্রে বিবেচনায় ছিল যে যদি একটি নির্বাচিত সরকার তার প্রশাসনিকবর্গকে নিজের মতো নিয়ন্ত্রণ না করতে পারে সেক্ষেত্রে তা শুধু তার নিজস্ব ক্ষমতা হরণই নয়, তা সংবিধানগ্রাহ্যও নয়। সাম্প্রতিক রায়দানে এই রুটিন ক্ষমতা কেজরিওয়ালের হাতেই ফিরে যাবে। একই সঙ্গে নিযুক্ত ২৬ অফিসারের নিযুক্তি ও বদলির ক্ষেত্রে তিনি স্বাধীনভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না।

কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে পাবলিক অর্ডার (অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা নিরাপত্তা), জমিজমা ও পুলিশ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে রাজ্যের এই নিজস্ব প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ খাটবে না। তারা কোনো আইনও পাশ করতে পারবে না। বাস্তবে মহামান্য আদালতের এই রায়ে একটা বিষয় চালু হল যে দিল্লিতে দু'টি সরকার চলবে, যেমন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ওপর রাজ্যপালের প্রাধান্য খাটবে না কিন্তু অনেক অনেক বিষয়ে খাটবে।

এখন বিজেপি যদি এই নির্দেশ মানতে না চায় সেক্ষেত্রে দিল্লি সরকারের আনা কোনো আইনকে অমান্য করতে গেলে তাকে লোকসভায় নতুন সংশোধিত আইন আনতে হবে। সংবিধানের ২৩৯এ এ ধারায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দিল্লিতে একটি বিধানসভা তৈরির প্রভিশন আছে। এই ধারার ৩ এর বি বলছে যে পূর্ববর্তী এ ধারা বলে লোকসভা থেকে আইন পাশ করিয়ে আনার ক্ষেত্রে এই উপধারা বাধা হতে পারবে না। যখন কোনো বিষয় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রয়োজন হবে।

এই সূত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ্য। সেখানকার Washington DC তৈরি হয়েছে Marryland ও Virginia'র অংশ বিশেষ নিয়ে। একটি সম্পূর্ণ আলাদা জাতীয় রাজধানী অঞ্চল বানানো হয়েছে। হ্যাঁ, Washington DC কিন্তু অন্য প্রদেশগুলির মতো সম পর্যায়ের ক্ষমতা ভোগ করে না। এখানকার বসবাসকারীরা অন্য প্রদেশবাসীর মত পূর্ণ ভোটাধিকারের অধিকারী নয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তারা ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকারী হলেও মার্কিন কংগ্রেসে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার তাদের নেই।

আমাদের দিল্লির বসবাসকারীরা

মিউনিসিপালটিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে, বিধানসভায় ও লোকসভার ক্ষেত্রেও তাদের পূর্ণ ভোটাধিকার। অর্থাৎ তাদের কোনো নাগরিক অধিকারই খর্ব হয়নি। যেখানে ধোঁয়াশা রয়েছে তা হলো কে অধিক ক্ষমতাধারী। দিল্লির বিধানসভা নাকি কেন্দ্রীয় সরকার? এই রায়ের পর পরিষ্কার হলো দু'জনেই সম্পূর্ণ বৈধ, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্র ভাগ আছে। এর পরও বিষয়টা হলো কিছুটা রাজনৈতিক। একটি দেশের জাতীয় রাজধানীর সরকারের মর্যাদা কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর সর্ববিষয়ে আজ্ঞাধীন থাকবে নাকি যে জনতার ভোটে তারা নির্বাচিত হয়েছে তাদের মঙ্গলের জন্য তারা স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী থাকবে?

এই সূত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অন্যান্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মতো বিজেপি যদি দিল্লিকেও একই Status -এ নিয়ে আসতে চায় সেক্ষেত্রে লোকসভায় আইন পাশ করতে হবে। কিন্তু কখনই LG-কে মাধ্যম করে নির্বাচিত সরকারের সব সিদ্ধান্তকেই প্রভাবিত করা যাবে না। আদালত এবিষয়ে স্ফটিক স্বচ্ছ রায় দিয়েছে।

এরই প্রতিতুলনায় মহারাষ্ট্র সক্রান্ত রায় আরও বেশি জটিল। বিষয়টিকে সংবিধান বেঞ্চ অনেক প্রশ্ন তুলে আরও বড়ো বেঞ্চে স্থানান্তরিত করেছে। ২০২২ সালের জুন মাসে চূড়ান্ত সাংবিধানিক টালমাটালের সময় রাজ্যপালের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকে বিধানসভায় গরিষ্ঠতা প্রমাণের আদেশ নিয়ে যেখানে দলের মধ্যেই আরও একটি বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে উঠেছে— ঠিক করেননি। এটি সংবিধানের objective criteria-র মনোমতো নয়। উল্লেখ্য, সেই সময় কোনো শিবসেনা বিধায়ক সরকারিভাবে জানাননি যে তারা শিবসেনা ছেড়ে দিচ্ছেন বা দল কোনো whip দিলে তাঁরা তা অমান্য করবেন। দ্বিতীয়ত, আদালত এই যুক্তি সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়েছে যে একনাথ শিণ্ডে গোষ্ঠী তাদের ইচ্ছেমত আলাদা whip জারি করে তাদের সমর্থনে থাকা বিধায়কদের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করতে পারত। আদালত মহাগুরুত্বপূর্ণভাবে জানিয়েছে এই whip দেওয়ার অধিকার দলের প্রধানের ক্ষমতাধীন কোনো বিধান সভার রাজনৈতিক দলের কর্তৃত্বাধীন নয়। তবে আদালত উদ্ধব সরকারকে পুনর্স্থাপন করার বিষয়ে কোনো রায় দেয়নি এই কারণে যে উদ্ধব মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার মতো হটকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আস্থা ভোট নেবার আগেই তিনি পদত্যাগ করে নিজের সরকারকেই বিপদে ফেলে দেন। আদালত আরও জানায় ক্ষমতাসীন সরকার যদি পদত্যাগ না করত সেক্ষেত্রে তারা সরকার ফিরিয়ে আনার আদেশ অনায়াসে দিতে পারতেন।

এই দু'টি মামলার রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে নেগেটিভ প্রতিক্রিয়া হয়েছে একদিকে দিল্লির LG ও মুম্বাইয়ের রাজ্যপালের সিদ্ধান্তে তাতে বিজেপি'রই মুখ পুড়েছে যথেষ্ট। কিন্তু রাজনীতিবিদরা প্রায়শই বিচারালয়ের আদেশকে খুব বেশি গুরুত্ব সৃষ্টিকারী বা মহাশক্তিশালী মনে করেন না। এজন্য তাদের কোনো গভীর লজ্জাজনক প্রতিক্রিয়াও হয় না। কিন্তু এই রায়ের পর শিণ্ডে সরকারের বাস্তব পরিস্থিতি ও পরিণতি কী হতে পারে তা আদৌ পরিষ্কার নয়। মহামান্য আদালত সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েই আদেশ দিয়েছেন যে শিণ্ডে পক্ষের বিধায়কদের পদ খারিজের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে বিধানসভার বর্তমান স্পিকারের ওপর।

এটা সকলেরই জানা বিজেপি'র রাহুল নারওয়েকারই মহারাষ্ট্র বিধানসভার অধ্যক্ষ তিনি কখনই এমন সিদ্ধান্ত নেবেন না যাতে বিজেপি-সেনা (শিণ্ডে) জোটের সরকার বিপদে পড়ে। নৈতিক বৈধতার দিক থেকে শিণ্ডের বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বৈধতা অন্য প্রশ্ন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি প্রশ্ন উঠে এসেছে যে একজন বিধানসভা অধ্যক্ষ কি কোনো গোষ্ঠীর বিধায়কদের অবৈধ ঘোষণা করতে পারেন? তাঁরা তো নির্বাচিত প্রতিনিধি। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এখন আরও বৃহৎ একটি বেঞ্চের অধীনে বিচারাধীন। এই বেঞ্চ ২০১৬ তে সুপ্রিম কোর্টের নেওয়া 'নবম তেরিয়া' বনাম অরুণাচল প্রদেশের স্পিকার এর মামলা খুঁটিয়ে দেখতে হবে। এই ক্ষেত্রে অনেক বিধায়ক স্পিকারের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। আদালত তখন রায় দিয়েছিলেন যে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আনা কোনো মোশান যদি অমীমাংসিত থাকে সেক্ষেত্রে অধ্যক্ষ কোনো নতুন নির্দেশ দিতে পারেন না। বর্তমান রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে এখন বিজেপিকে দ্বিতীয়বার ভাবতে হবে রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে যে তাঁকে যতদূর ক্ষমতাবৃত্তের মধ্যে রাখা যায়। আর যদি তারা দিল্লি সরকারের কাজকর্ম ন্যায়সঙ্গত না মনে করে সেক্ষেত্রে লোকসভায় যথাযথভাবে সংশোধিত আইন প্রণয়ন করাক। গভর্নর সর্বদা নিয়ামক হতে পারেন না।

(লেখক স্বরাজ্য পত্রিকার সম্পাদকীয় নির্দেশক)

শোক সংবাদ

দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড় শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক প্রদীপ কুমার সাহা গত ২৫ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তাঁর কনিষ্ঠভ্রাতা প্রহ্লাদ কুমার সাহা বর্তমানে বিজয়গড় শাখার মুখ্যশিক্ষক।

বিশেষ সূচনা

আগামী ২৯ মে-র স্বস্তিকা হিন্দু হৃদয়সম্রাট 'শিবাজী মহারাজ বিশেষ সংখ্যা' রূপে প্রকাশিত হবে। সংখ্যাটিতে শিবাজীর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করবেন বিশিষ্ট লেখকবৃন্দ। সংরক্ষণযোগ্য এই সংখ্যাটির মূল্য একই থাকছে (১৬.০০ টাকা)।

অতিরিক্ত কপির জন্য আগাম জানান, যাতে আপনার চাহিদা মতো স্বস্তিকা পাঠানো সম্ভব হয়।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে মুসলমান-ভোট ও কংগ্রেসের জয়ের পর 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান

সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা ছবি ভাইরাল হয়েছে যে গত ১৩ মে কংগ্রেসের কর্ণাটক রাজ্যে ভালো ফলের পর দলের কর্মী-সমর্থকরা অতি উল্লাসে সে রাজ্যের বেলাগাভি বলে একটি জায়গায় 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দেন। ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে,একদল কংগ্রেস সমর্থক বেলাগাভির রাস্তায় দলের জয়ের পর চাঁদ-তারা আঁকা পতাকা নিয়ে রাস্তায় নেমে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন। সেই জমায়েত থেকেই যেমন পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান ওঠে তেমনি 'নারায়ে তকবীর' জাতীয় ইসলামিক স্লোগানও দেওয়া হয়। সমগ্র ঘটনা যখন ঘটে তখন কর্ণাটক পুলিশের একটি ব্যাটেলিয়ন সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য উপস্থিত ছিল। তাঁদের চোখের সামনেই এই স্লোগান দেওয়ার ঘটনা ঘটে। কিন্তু সব দেখেশুনেও তাঁরা নিশ্চুপ ছিলেন। কর্ণাটকে বিজেপির মুখপাত্র এমবি জিরাইল এই ঘটনার ভাইরাল ভিডিয়ো তুলে ধরে দোষীদের চিহ্নিতকরণ ও তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন।

কংগ্রেস নেতা আসিফ (রাজু) সইতের বক্তব্য যে এটি একটি জাল ভিডিয়ো। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে নাকি এই ভিডিয়ো সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো হয়েছে। সে কংগ্রেস যে দাবিই করুক না তাদের কপালে কিন্তু সত্যিই চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে, ভোটের ফলের পর তাদের কাছে মুসলমান সমাজের প্রবল প্রত্যাশার চাপ। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, সেরাজ্যে এবার মুসলমান ভোটের সিংহভাগই কংগ্রেসের দিকে গিয়েছে। কারণ তাদের মন জয়ে নির্বাচনী ইস্তাহার বিপুল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কংগ্রেস এবং সেটাই কর্ণাটকে খেলা ঘুরিয়ে দিয়েছে। দ্য ওয়াল ওয়েবপোর্টালের মতে, কংগ্রেস পনেরো আসনে মুসলমান প্রার্থী দিয়েছিল। তাদের নয়জন জয়ী হয়েছেন। এই শুষ্ক আসনের পরিসংখ্যান ও তাতে মুসলমান প্রার্থীর সংখ্যা বিচার করে কর্ণাটকে কংগ্রেসের সরকার গড়ার পেছনে মুসলমানদের অবদান বোঝা যাবে না। পোর্টালটির বিশ্লেষণ, কর্ণাটকে কংগ্রেসের জয়ের মূল স্থপতি মুসলমানরা। ৭২টি আসনে তারা হাত চিহ্নের প্রার্থীর জয় নিশ্চিত করেছেন।

কংগ্রেসকে এই বিপুল সমর্থনের প্রতিদান চায় রাজ্যের মুসলমান সমাজ। তাদের একাধিক সংগঠনের তরফে সুন্নি উলেমা বোর্ড ও রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের সদস্যরা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে দেখা করে এই দাবি করেছেন, মন্ত্রীসভায় একজন মুসলমানকে উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ দিতে হবে। এছাড়াও পাঁচজন মুসলমান বিধায়ককে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী করতে হবে। যখন এই খবর প্রকাশিত হবে তখন কর্ণাটক মন্ত্রিসভার চিত্রটা পরিস্কার হয়ে যাবে। আমরা শুধু মুসলমান সমাজের দাবিটুকু তুলে ধরলাম। সেই দাবি কতটা মানা হবে রাজনৈতিক অঙ্কের ওপর তা নির্ভর করছে।

কংগ্রেস সুত্রের খবর, ভোটের আগে দলের তরফে মুসলমান বিধায়ককে উপমুখ্যমন্ত্রী করার দাবি মৌখিক ভাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল। যদিও মুসলমান সংগঠনগুলি ত্রিশ কেন্দ্রে প্রার্থী করার দাবি জানালেও কংগ্রেস তা মানেনি মূলত কৌশলগত কারণে। ত্রিশ কেন্দ্রে মুসলমানদের প্রার্থী করলে কংগ্রেসের সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতি সে রাজ্যের হিন্দুদের চোখে ধরা পড়ে যেত। ফলে নির্বাচনে তাঁদের বোকা বানানোর কাজটা হতো না। তথ্যাভিজ্ঞমহলের মতে, কংগ্রেস কর্ণাটকের প্রচারে ভারসাম্য রক্ষার রাজনীতিও অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে করেছে।

এখন অন্য রাজ্যে ভোটের কথা মাথায় রেখেও কংগ্রেস মুসলমান বিধায়ককে উপমুখ্যমন্ত্রী করার ভাবনাচিন্তা করছে। আবার দলের মধ্যে ভিন্ন মতও আছে যে, নয় মুসলমান বিধায়কের মধ্যে থেকে পাঁচজনকে মন্ত্রী করা হলে কংগ্রেসের মুসলমান তোষণ রাজনীতি বে-আব্রু হয়ে পড়বে।

কর্ণাটক ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান সাফি শাদি প্রকাশ্যেই বলেছেন, 'নির্বাচনের আগেই কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে কথা হয়েছিল মন্ত্রীসভায় জনা পাঁচেক মুসলমানকে নেওয়া হবে।' বিভিন্ন মুসলমান সংগঠনের নেতারাও প্রকাশ্যেই দাবি করতে শুরু করেছেন যে কংগ্রেসের বিপুল জয়ের পিছনে সংখ্যালঘুদের অবদান সবচেয়ে বেশি। রাজ্য কংগ্রেস নেতারা এই প্রচারে লাগাম দিতেও পারছেন না।

সাফি শাদির বক্তব্য, বিজেপিকে ঠেকাতে মুসলমানরা এককাট্টা হয়ে কংগ্রেসের পাশে দাঁড়িয়েছে, তাই কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। তাই তাঁরা দাবি না করলেও একজন মুসলমানকে উপমুখ্যমন্ত্রী করাটাই কংগ্রেসের কাছে মুসলমানদের প্রত্যাশা। সাদির আরও বক্তব্য, উপমুখ্যমন্ত্রী এবং পাঁচমন্ত্রীর দাবি সেই তুলনায় নাকি সামান্যই। যদিও কংগ্রেস নেতাদের অনেকেই মনে করছেন কৃষ্ণর সরকারের সময়ের তুলনায় এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। উপমুখ্যমন্ত্রী-সহ ছয়জনকে মন্ত্রী করা হলে মন্ত্রীসভার ভারসাম্য রক্ষা কঠিন হয়ে পড়বে। কারণ এবার জাতের অঙ্কও আরও বেশি করে মাথায় রাখতে হচ্ছে কংগ্রেসকে। ডিকে শিবকুমারের নেতৃত্বে দ্বিতীয় প্রভাবশালী জনগোষ্ঠী ভোক্কালিগাদের বিপুল সমর্থন কংগ্রেসের বাক্সে এসেছে। ফলে এতজন মুসলমানকে মন্ত্রীসভায় জায়গা দিলে তাঁদের অসুন্তুষ্ট করা হবে। সেই ঝুঁকি আপাতত কংগ্রেসের কেউ নিতে চাইছেন না। তবে ভারতীয় রাজনীতিতে ভোটের স্বার্থে মুসলমান তোষণ আর এর ফলে জিতলে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান আরও একবার প্রকাশ্যে এল। □

বিজেপি সমর্থক রাজবংশীরা কি রাজবংশী নয়?

সাধন কুমার পাল

'তাহলে বিজেপি করা রাজবংশীরা কি রাজবংশী নয়? আর তৃণমূল করা রাজবংশীরাই শুধু রাজবংশী? এটা দ্বিচারিতা হচ্ছে না? আমরা এটার সঠিকভাবে তদন্ত এবং বিচার চাই। যে পুলিশ অফিসার নির্মমভাবে একদম কাছ থেকে ৩৩ বছরের রাজবংশী যুবককে গুলি করে হত্যা করল তাকে অবিলম্বে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে গ্রেপ্তার করা হোক।' —এই কথাগুলি বলেছেন তৃণমূলের সঙ্গে থাকা রাংজবংশী নেতা ও তৃণমূলের সৌজন্যে রাজবংশী ভাষা আকাদেমি ও রাজবংশী উন্নয়ন বোর্ডের সভাপতি পদ অলংকৃত করা বংশীবদন বর্মন। যুবরাজ অভিষেক নবজোয়ারের নামে নব জঙ্গলরাজ কায়েমের মহড়া সেরে কোচবিহার ছাড়তেই বংশী বেসুর হয়ে বেজে উঠলেন।

বংশীবদন আরও বললেন, 'আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছুদিন আগে দিনহাটায় প্রেমকুমার বর্মন নামে আমাদের একজন রাজংবশী যুবককে বিএসএফ গুলি করে মেরেছে। তার জন্য এত আন্দোলন, এক কিছু হলো। এবার সেই একই রাজবংশী যুবককে কালিয়াগঞ্জে পুলিশ গুলি করে মেরেছে। সেটার বেলায় আবার চুপচাপ। প্রেমকুমার বর্মনের মৃত্যু প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এখানে একটা প্রশ্ন আছে। কেন্দ্রীয় বাহিনি বিএসএফ যেখানে গুলি করে মেরেছে, সেটা ভোরবেলায়, কাঁটাতারের কাছে। এটা একটা ব্যাপার। তার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া দরকার বা হোক। সেই অপরাধীরও শাস্তি হোক। কিন্তু কালিয়াগঞ্জে দেখা গেল এক পরিবারের বৃদ্ধকে পুলিশ টানাটানি করছে। তখন তাঁর ভাইপো বলে, আমার বৃদ্ধ কাকুকে কেন টানাটানি করছেন? তার পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গে সঙ্গে বুকে গুলি করে তাকে ঘটনাস্থলেই মেরে ফেলা হলো। আইনে আছে, যত বড়োই অপরাধী হোক না কেন, প্রয়োজনে তার কোমরের নীচে গুলি করতে পারে পুলিশ। সেখানে একেবারে বুকে গুলি করে মেরে ফেলে দিল! তাহলে এই রাজবংশীর ক্ষেত্রে কী হবে? শোনা যাচ্ছে যে ওই পরিবার নাকি বিজেপি সমর্থক। বংশীবদনের হুঁশিয়ারি, 'এভাবে যদি চলতে থাকে, আর এই ঘটনার যদি কড়া শাস্তি না হয়, তাহলে আগামীদিনে ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তার জন্য দায়ী থাকবে মমতার পুলিশ প্রশাসন ও সরকার।'

এই লেখার মাধ্যমে বংশীবাবুকে বলব বিষয়টি একটু এই ভাবে দেখবেন। প্রেমকুমার রাজবংশী বলে মমতা-অভিষেক অ্যান্ড কোং-এর দরদ উছলে পড়ছে তা কিন্তু নয়। আসল লক্ষ্য হচ্ছে বিএসএফ-কে দুর্বল করা, টাইট দেওয়া, চাপে রাখা। যে কারণে মমতা-অভিষেক অ্যান্ড কোং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ-কে আক্রমণ করে থাকে ঠিক একই কারণে আসানসোলের কয়লাখনি এলাকায় নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআইএসএফকে আক্রমণ করে।

> **তৃণমূলের কাছে রাজবংশী, জনজাতি, সংখ্যালঘু বলে কিছু নেই। ওদের চোখে শুধুই ভোটব্যাংক। বাম জমানাতেও দেখেছি যারা ওদের ভোট দেবে না তাদের ধন, মান, জীবন কোনোটাই সুরক্ষিত থাকতো না। এ জমানাতেও কোনো পরিবর্তন হয়নি, বরং একটু বেড়েইছে।**

প্রেমকুমার যেহেতু রাজবংশী সেজন্য বিএসএফ গুলিতে মৃতের গায়ে রাজবংশী ফ্লেভার দিলে সেই টাইট দেওয়ার কাজটা আরও জোরালো হয় বলেই এই রাজবংশী দরদ। মমতা-অভিষেক অ্যান্ড কোং শুধুমাত্র কালিয়াগঞ্জে পুলিশের গুলিতে নিহত মৃত্যুঞ্জয় বর্মন নিয়ে কোনো রকম প্রতিক্রিয়া দেয়নি কেন বংশীবদনবাবু এই প্রশ্ন তুলেছেন। রাজবংশী যুবক আনন্দ বর্মনের হত্যার ব্যাপারে বংশীবাবুর রাজনৈতিক আশ্রয় তৃণমূল কংগ্রেস কার্যত বোবা-কালার ভূমিকা নিয়েছিল বললেই ভালো হয়। তখন কিন্তু বংশীবাবুদেরও প্রতিক্রিয়া দিতে দেখা যায়নি। মৃত্যুঞ্জয় বর্মন ও আনন্দ বর্মনের হত্যায় অদ্ভুত মিল রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে হত্যাকারী বলে অভিযুক্তরা দিদির প্রিয় দুধেল গাই। মুসলমান মেয়েকে হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করিয়ে বিয়ে করার জন্য নাকি জেহাদিদের লক্ষ্যে ছিল মৃত্যুঞ্জয় বর্মন। সেক্ষেত্রে মুসলমান পুলিশ অফিসারের গুলিতে নিহত হওয়ার বিষয়টি ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দেয়, এমন মারাত্মক অভিযোগও উঠছে। স্বাভাবিকভাবেই মুখ্যমন্ত্রী প্রতিক্রিয়া দেবেন এটা ভাবা যায় না। ২১-এর নির্বাচনের সময় শীতলকুচিতে আনন্দর মৃত্যুর পরেপরেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলিতে নিহত মনিরুজ্জামান রহমান, সামিউল মিয়াঁ, সামিদুল মিয়াঁ ও নুর আলম নামে চার যুবকের মৃত্যুতে মুখ্যমন্ত্রী এতটাই বিচলিত হয়েছিলেন যে হেলিকপ্টারে করে এসে তিনি নিহতদের পরিবারকে সান্ত্বনা দিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন অবশ্য আনন্দর পরিবারকেও জোর করে সেই সান্ত্বনা সভায় তুলে আনা হয়েছিল।

তালিকা দীর্ঘ। দাড়িভিটে পুলিশের গুলিতে মৃত রাজেশ, তাপস। ধর্ষিতা হয়ে খুন হয়েছে সিতাইয়ের ঝরনা বর্মন, দিনাজপুরের জবা, প্রমিলা, কালিয়াগঞ্জের ডলি বর্মন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ধর্ষিতা হিন্দু, ধর্ষক মুসলমান। মনীষী পঞ্চানন বর্মার জীবনী পড়লে জানা যায় দেড়শো

ফঃ ২

বছর আগেও অবিভক্ত উত্তরবঙ্গে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। উপেন্দ্রনাথ বর্মনের ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত থেকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি তুলে ধরলেই বোঝা যাবে সেই দিনের পরিস্থিতি এবং আজকের পরিস্থিতে কোনো তফাত নেই। উপেন্দ্রনাথ বর্মন লিখেছেন, '১৩৩০ সনে গাইবান্দা মহকুমার পলাশবাড়ি থানা এলাকায় মুসলমান গুন্ডারা বরদাসুন্দরী বৈষ্ণবী নাম্নী এক বিবাহিতা যুবতীকে জোরপূর্বক লইয়া যায়। এটি সে সময়ের এতদ অঞ্চলে নারী হরণের ও ধর্ষণের প্রথম চাঞ্চল্যকর ঘটনা। বরদার স্বামী পুলিশে খবর দেয়, কিন্তু পুলিশের শৈথিল্যবশত বরদা ও অপরাধীদের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। বরদার স্বামী ক্ষত্রিয় সমিতির শরণ লইলে রায়সাহেব জেলা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে রংপুর সদর হইতে পুলিশ ইনসপেক্টর ঘটনাস্থলে প্রেরিত হয়। বরদাকে উদ্ধার করা হয়; কিন্তু ঘটনা তদন্তের অজুহাতে দিনের পর দিন ডাকবাংলোয় অবস্থান করিয়া উক্ত ইনসপেক্টর বরদাকে ধর্ষণ করিয়া থাকে। ঠাকুর পঞ্চানন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এস.কে. হালদার আইসিএস-এর কী অভিযোগ করিলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং ইংরেজ পুলিশ সুপারকে সঙ্গে লইয়া ঘটনাস্থল অভিমুখে রওনা হন। তখন বর্ষাকাল। রাস্তার এক স্থানে মোটর চলে। রাস্তায় মোটর রাখিয়া হাঁটুজল ভাঙিয়া ঘটনা স্থলে উপস্থিত হন এবং ইনসপেক্টরের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ পায়, তখনই তাহাকে সাসপেন্ড করেন। পুলিশ সুপার নিজে তদন্তের ভার লইয়া এবং প্রমাণ পাইয়া ইনসপেক্টরকে চাকুরি হইতে বরখাস্ত করেন। সাতজন আসামির বিরুদ্ধে মামলা দাখিল হয় এবং দায়রা জজের বিচারে আসামিদের আট বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হয়। নারী হরণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে কেবল পুলিশের উপর নির্ভর করিয়া রায়সাহেব সমিতিতে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করিয়া ধর্ষিতা নারী উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন।'

ঘৃতকুমারী

"জিলা রংপুর থানা পীরগঞ্জ কাটাদুয়ার গ্রাম নিবাসিনী ঘৃতকুমারী বৈষ্ণবী, স্বামী শব্দরাম বৈরাগী ও ভাতিজী বুচির সহিত বাস করিত। ইংরেজি ১৯২৩, বাংলা ১৩৩০ সালের ভাদ্র মাসে একদিন রাত্রিকালে সকলের নিদ্রার সময় ১০/১২ জন মুসলমান গুন্ডা হঠাৎ বাড়িতে প্রবেশ দুয়ার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করে। বুচিকে ও শব্দরামকে টানিয়া বাহির করিয়া শব্দরামকে মারিতে থাকে। ঘৃতকুমারী ভয়ে মাচার তলে প্রবেশ করে। মাচার তল হইতে ঘৃতকুমারীকে পাঞ্জা ধরিয়া উল্টো মুখে ছেচড়াইয়া টানিয়া আনিয়া কয়জন গুন্ডা তাকে ঘাড়ে তুলিয়া লইয়া যায়। দুয়ারের মোকা ধরিয়া আত্মরক্ষা করিতে ঘৃতকুমারী চেষ্টা করে। কিন্তু গুন্ডারা মোকার পই ও বেড়া ভাঙিয়া ঘৃতকুমারীকে লইয়া যায়। শব্দরাম বৈরাগীকে এমন মাইর গুন্ডারা মারিল যে তাহার ফলে পাঁচ দিনের মধ্যে সে মরিয়া গেল।

হরণের রাত্রি গুন্ডারা ঘৃতকুমারীকে একটি বাড়িতে লইয়া গিয়া রাখিল; অন্য কোনোরূপ অত্যাচার করিল না। কিন্তু তৎপরদিন সেই বাড়ি হইতে অন্য বাড়িতে লইয়া যাওয়ার পথে একটি স্কুলঘরে গুন্ডারা ঘৃতকুমারীকে উপর্যুপরি রিপুচরিতার্থর জন্য এত অত্যাচার করিল যে ঘৃতকুমারী শেষে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। পরদিন চেতনা ফিরে পেয়ে দেখল যে সে একটা গৃহস্থের বাড়িতে আছে। কাটাদুয়ারবাসী ক্ষত্রিয়েরা বুচিকে লইয়া থানায় এজাহার করিতে যাইল। দারোগা এজাহার লইল না। নিকটে একটা গ্রামে অন্য কাজের জন্য জমাদার আসিয়াছিল; তাহাকে শব্দরামকে দেখিতে ও তাহার উক্তি লিখিয়া লইতে বলা হইল, জমাদার আসিল না ও তাহা করিল না। মোকদ্দমা চাপা দেবার চেষ্টা হইল কিন্তু রংপুর দর্পণে ঘটনা প্রকাশ পাইল। সদর সাবডিভিশন্যাল অফিসার মোকদ্দমার তদন্ত করিলেন। ওদিকে ঘৃতকুমারী নিরুদ্দেশ। সাত কী আট মাস পরে গাইবান্ধা সাবডিভিশনে একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়ার সময় চৌকিদার কর্তৃক ঘৃতকুমারী ধরা পড়িল। মোকাদ্দমা চলিল। কয়জন গুণ্ডার তিন চারি বৎসর করিয়া জেল হইল।"

উত্তরবঙ্গে এমন ভয়ংকর মৃত্যুর লম্বা তালিকা আছে যেখানে মমতা-অভিষেক অ্যান্ড কোং কেন, মমতার প্রসাদ ভোগী বংশীবদনের মতো রাজবংশী নেতাদের প্রতিক্রিয়াও পাওয়া যায়নি। রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা ধর্ষণ শ্লীলতাহানির ঘটনায় গর্জে উঠেছিলেন। সমাজের ঘুম ভাঙানোর জন্য লিখেছিলেন তীব্র শ্লেষাত্মক 'ডাংধরী মাও' কবিতা। কবিতায় রাজবংশী নারীদের আত্মরক্ষার জন্য লাঠিখেলা, অস্ত্র প্রশিক্ষণের উল্লেখ করেছিলেন। উত্তরবঙ্গে পঞ্চানন অনুরাগীর অভাব না থাকলেও নারীর সম্মান রক্ষার আন্দোলনে কাউকে এগিয়ে আসতে দেখা যায় না।

কোচবিহারে অনন্ত মহারাজের অনুগামীদের বাড়বাড়ন্তে বংশীবদনের গোষ্ঠী কার্যত চাপা পড়ে গিয়েছিল। অনন্ত মহারাজকে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপহার পাঠিয়ে, নিজের সভায় আমন্ত্রণ জানিয়ে সৌজন্য দেখালেও তিনি যে তৃণমূলের বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠেছেন, তা তৃণমূলের নীচুতলার কর্মীরাও বিশ্বাস করেন না। তাহলে নিজেদের ঘরে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর অনন্ত মহারাজের সৌজন্য দেখানোকে যে সুনজরে দেখেননি তা স্পষ্টভাবে জানান দেওয়ার জন্যই কি সোচ্চার হয়েছেন বংশীবদন? আসলে এই ধরনের রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রাজবংশী প্রেমের চেয়ে ক্ষমতার রাজনীতিই মুখ্য। কারণ উত্তরবঙ্গে লাভজেহাদের মতো নারকীয়তার শিকার হয়ে যে ভাবে রাজবংশী বোনেরা হারিয়ে যাচ্ছে তার প্রতিবাদ তথাকথিত রাজবংশী দরদিদের করতে দেখা যায় না।

ক্ষমতার রসায়ন ছাড়া মমতা-অভিষেক অ্যান্ড কেং কারও দরদি নয়। সম্প্রতি বালুরঘাট কোর্ট মোড় থেকে তৃণমূলের জেলা পার্টি অফিস পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা শনকইর গ্রামের বাসিন্দা জনজাতি মহিলারা দণ্ডি কেটে আসেন। জনজাতি মহিলাদের দণ্ডি কাটার ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই গোটা রাজ্য কিংবা বলা ভালো দেশ জুড়ে শোরগোল পড়ে যায়। তৃণমূলের বক্তব্য, মহিলারা নাকি বিজেপিতে যাওয়ার ভুল বুঝতে পারেন এবং দণ্ডি কেটে প্রায়শ্চিত্ত করে তৃণমূল পার্টি অফিসে এসে দলে ফিরে আসেন। মমতা-অভিষেক অ্যান্ড কোং কিন্তু এ ব্যাপারে লোক দেখানো কিছু বিষয় ছাড়া কারও বিরুদ্ধে কোনো কঠোর পদক্ষেপ নেয়নি। গত ২০২২-এর নভেম্বর মাসে নন্দীগ্রামে এক সভায় তৃণমূলের অনেক নেতা-মন্ত্রীর সামনে রাজ্যের কারাদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বাহ্যিক রূপ নিয়ে অত্যন্ত কুরুচিকর একটি মন্তব্য করেন। অখিল গিরির মন্তব্য নিয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু হওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব কোনো কঠোর ব্যবস্থা নেয়নি। একটু ভালো করে ভাবলেই স্পষ্ট হবে তৃণমূলের কাছে রাজবংশী, জনজাতি, সংখ্যালঘু বলে কিছু নেই। ওদের চোখে শুধুই ভোটব্যাংক। বাম জমানাতেও দেখেছি যারা ওদের ভোট দেবে না তাদের ধন, মান, জীবন কোনোটাই সুরক্ষিত থাকতো না। মমতা-অভিষেক অ্যান্ড কোং কিন্তু শুধু এই নীতিরই অন্ধ অনুকরণ, অনুসরণই নয়, তার চেয়ে বেশিই করছে। ▯

জামাইষষ্ঠী এখন বাঙ্গালির সংস্কৃতির অঙ্গ

ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়

কথায় বলে, 'চেয়ে যায়, নিয়ে যায়, খেয়ে যায় বাঙ্গালির মেয়ে।' কথাটা সত্য। শ্বশুরঘরে বাঙ্গালির মেয়ে শুধু শ্রম দেয়, বিনিময়ে আধপেটা ভাতও জোটে কিনা সন্দেহ, তাই রাজ্যের খিদে নিয়ে সে আসে বাপের বাড়ি। মেয়ের এই অবস্থায় মায়ের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়, তিনি চেষ্টা করেন মেয়ের সুখের জন্য জামাইকে খুশি করতে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী— এই দিনটা পশ্চিমবঙ্গের মেয়ের মায়েরা জামাইকে খুশি করার জন্য উৎসর্গ করেন। এই দিনটা জামাইষষ্ঠী।

অবশ্য এ বিষয়ে সামান্য মতপার্থক্য আছে। 'জামি' শব্দের অর্থ কুলবধূ। বহুবচনে জামি হয় জাময়ঃ। প্রাচীনকালে জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে কুলবধূরা মা বিন্ধ্যবাসিনী ষষ্ঠীর উপাসনা করতেন সন্তানবতী হওয়ার কামনায়। 'জাময়ঃ ষষ্ঠী' থেকে পরবর্তীকালে এসেছে জামাইষষ্ঠী।

বর্তমানে জামাইষষ্ঠী সম্পূর্ণ রূপে একটি বাঙ্গালি লোকাচার। ষষ্ঠী হলেন প্রসূতি এবং শিশুর রক্ষয়িত্রী এক লৌকিক দেবী। তাই এ রাজ্যের সকল সন্তানের মায়েরাই ষষ্ঠীর ব্রত করেন। এক-একটি ষষ্ঠী উৎসর্গীকৃত হয় এক-এক নামে। যেমন— নীলষষ্ঠী (চৈত্র মাসের শুক্ল ষষ্ঠী), চন্দনষষ্ঠী (বৈশাখ মাসের শুক্ল ষষ্ঠী) ইত্যাদি। বাঙ্গলার প্রকৃতি 'আম-কাঁঠালের মধুর গন্ধে জ্যৈষ্ঠ মাতায় তরুতল।' এ সময় জামাইকে ডেকে এনে মাছে-ভাতে, ফলে-মূলে যথেচ্ছ খুশি করা সম্ভব, তাই বাঙ্গলার মায়ের জ্যৈষ্ঠের শুক্লষষ্ঠীকে উৎসর্গ করেন জামাইয়ের নামে।

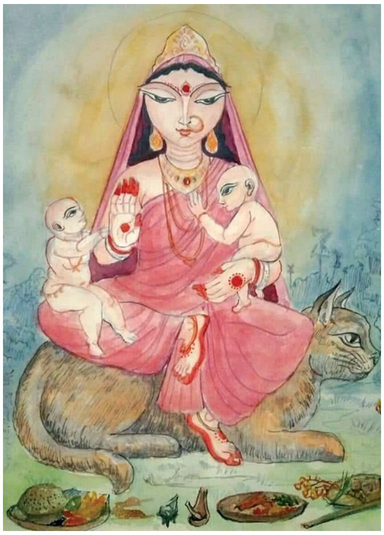

জামাইষষ্ঠীর দিন প্রভাতে ষষ্ঠীর তত্ত্ব নিয়ে বধূর বাপের বাড়ি থেকে দাদা বা ভ্রাতৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তি আসেন জামাই ও মেয়েকে নিয়ে যাবার জন্য। তত্ত্বে থাকে শ্বশুরগৃহের সকলের জন্য নতুন পোশাক, ফল, নতুন উৎপাদিত ফসল, পান ইত্যাদি। শ্বশুরগৃহ থেকে পুত্র-পুত্রবধূ এবং বধূর বাপের বাড়ির সকলের জন্য নতুন পোশাক যায় কন্যার পিত্রালয়ে। কন্যাকে পেয়ে মা যারপরনাই খুশি হন, তিনি উপবাসী থাকেন, জামাইকে বরণ করে ঘরে আনেন। ভালো-মন্দ খাওয়া, কুশল সংবাদ নেওয়া— এসবের মধ্যে দিয়ে আনন্দে কাটে সারাদিন।

জামাইষষ্ঠী নিয়ে একটি লোককথা প্রচলিত আছে।

এক বধূ মাঝেমধ্যেই খাবার চুরি করে খেতো, আর দোষ দিতো তার পোষা বেড়ালটার নামে। আমরা সবাই জানি, বেড়াল হলো মা ষষ্ঠীর বাহন, সুতরাং বেড়ালটি তার ক্ষোভের কথা মা ষষ্ঠীকে জানাতো। ওই লোভী বধূটির শাশুড়িমাতা এক জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ষষ্ঠীর দিন ষষ্ঠী পালনের জন্য মিষ্টি বানালেন, দই পাতলেন, আর পায়েস রান্না করলেন। তিনি স্নানে যাবার আগে লোভী বধূটিকে সব দেখতে বলে গেলেন। বধূটি লোভ সামলাতে পারলো না, অনেকটাই পায়েস, মিষ্টি, দই খেয়ে ফেলল। বেড়ালের নামে দোষ দেবার জন্য সে বেড়ালের মুখে দই লাগিয়ে দিল। শাশুড়িমাতা স্নান করে ফিরে এই দৃশ্য দেখে বেড়ালটিকে বেশ কয়েক ঘা লাঠির বাড়ি দিলেন। মনের দুঃখে বেড়ালটা মা ষষ্ঠীর কাছে গিয়ে কাঁদতে লাগলো। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী বেড়ালটিকে প্রতিকার করার আশ্বাস দিলেন। এর কিছুদিন পরে লোভী বধূটির একটি সন্তান হলো। পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সবাই দেখলো সন্তানটি নেই। পাড়ায় পাড়ায় খোঁজ করা হলো, কিন্তু শিশুটিকে আর পাওয়া গেল না। একবার নয়, দু'বার নয়, এই ভাবে বধূটির সাত সন্তান নিখোঁজ হয়ে গেল। তখন পাড়ার লোকেরা ওই বধূটিকেই এই ঘটনার জন্য দায়ী করল। এই অপবাদ সহ্য করতে না পেরে বধূটি মা ষষ্ঠীর কাছে এসে কাঁদতে লাগলো। ষষ্ঠী ঠাকুরানির দয়ার শরীর, তিনি বধূটিকে তার সাত সন্তান ফিরিয়ে দিলেন। খুশি হয়ে বধূটি ষষ্ঠীর ব্রত পালন করতে লাগলো। তার সন্তানেরা বড়ো হলো, কন্যাদের বিয়ে হলো। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল ষষ্ঠীতে বধূটি তার মেয়ে-জামাইকে নিমন্ত্রণ করে জামাইষষ্ঠী পালন করতে লাগলো।

এটি একটি ব্রতকথা হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। বাঙ্গলার লোকসংস্কৃতিতে এমন বহু কথা, আচার, সংস্কার, রীতি আছে। মেয়ের বিবাহের পর যতদিন না প্রথম সন্তান জন্মাচ্ছে, মেয়ের বাবা-মা মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে অন্নগ্রহণ করবেন না— এটা বাঙ্গলার একটা রীতি। অথচ দীর্ঘদিনের অদর্শনে মেয়ের মা মেয়ের খোঁজখবরের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। খানিকটা সেই তাগিদেও জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্ল ষষ্ঠীতে বা অরণ্যষষ্ঠী-তিথিতে মেয়ের মা একটি ব্রত পালন করেন মেয়ে- জামাইয়ের মঙ্গল কামনায়। কালক্রমে তা জামাই আপ্যায়নের প্রথার পথ ধরে এবং জামাইষষ্ঠীতে পরিণত হয়। কোনো কোনো লোককথায় পাওয়া যায়, লোভী বধূ তার হারানো সন্তানদের পাওয়ার জন্য অরণ্যে ষষ্ঠীপুজো করেন এবং অরণ্যেই সন্তানদের খুঁজে পান। তাই এই ষষ্ঠীকে অরণ্য ষষ্ঠীও বলে।

মা ষষ্ঠী বা ষষ্ঠী ঠাকুরানি বাঙ্গলার লোকায়ত দেবী হিসেবে পূজিতা হন। তাঁর বাহন বিড়াল। তাঁর মূর্তিতে দেখা যায়, তাঁর কোলে এক বা একাধিক শিশু। বঙ্গ, বিহার, ওড়িশাতে শিশু জন্মের ছয়দিনের মাথায় ষষ্ঠীমাতার পুজোর প্রচলন আছে। এই লৌকিকদেবী ষষ্ঠীর কালক্রমে পৌরাণিকীকরণ ঘটেছে। বায়ু পুরাণে তাঁকে ঊনপঞ্চাশজন দেবীর অন্যতমা বলা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি অনুযায়ী শিব ও উমার সন্তান স্কন্দের পালিকা হলেন ষষ্ঠী। পদ্মপুরাণে আবার ষষ্ঠীকেই স্কন্দের পত্নী বলা হচ্ছে। নৃতত্ত্ববিদ সুধীর রঞ্জন দাস মনে করেন, প্রাগৈতিহাসিক হরপ্পা সভ্যতাতে এমন দেবীমূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে, যার সঙ্গে ষষ্ঠীমূর্তির সাদৃশ্য রয়েছে।

শ্বশুরগৃহে থাকা কন্যাকে জামাই-সহ নিমন্ত্রণ করে উৎসব পালনের চিত্র সাঁওতাল সমাজেও পাওয়া যায়। কার্তিক মাসের দীপান্বিতা প্রতিপদে সাঁওতাল কৃষকদের ঘিরে ঘরে পালিত হয় বাঁদনা পরব। প্রতিপদের দিন মেয়ে-জামাইকে নেমন্তন্ন করা হয়। সেদিন সকাল থেকেই চলে চাষের যন্ত্রগুলির পূজা। লাঙল, জোয়াল, মই তুলসী তলায় রাখা হয়। ধুয়ে, মুছে সেগুলিকে শুদ্ধ করা হয়। গোরুর শিং-এ ধানের শিষের তৈরি গয়না পরিয়ে দেওয়া হয়, কৃষিযন্ত্রগুলিকে পুজা করে ঘরের ছাতে রেখে দেওয়া হয়। সাঁওতালরা বিশ্বাস করেন, দীপান্বিতা প্রতিপদে স্বয়ং মহাদেব আসেন কৃষকগৃহে। তাই গোয়াল পরিষ্কার করা হয়, ফল আতপচাল, মিষ্টি দিয়ে নৈবেদ্য দেওয়া হয়, মোরগ বলি হয়, গরৈসা পিঠা বানানো হয়। সারারাত ধরে চলে উৎসব। পরের দিন অর্থাৎ দ্বিতীয়ার দিন সাঁওতালরা পালন করেন 'জামাই বাঁধনা'। এদিন বাঁধনা পরবের শেষ দিন। এদিন মেয়ে-জামাইকে নিয়ে আসা হয়, বরণ করে, নতুন পোশাক দেওয়া হয়। পিঠা, বলির মাংস ইত্যাদি দিয়ে তাঁদের খাবার-পরিবেশন করা হয়, গুরুজনেরা তাদের দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

বর্তমানে জামাইষষ্ঠী বাঙ্গলার অন্যতম জনপ্রিয় উৎসব মাতৃসমা শাশুড়ি জামাইয়ের মঙ্গলকামনায় ব্রত পালন করেন। নতুন পোশাক, পাঁচ রকমের ফল, ১০৮টি দূর্বা, শ্যালক-শ্যালিকার সঙ্গে ঠাট্টা- তামাসার পাশাপাশি ভোজনসিক বাঙ্গালির রসনাতৃপ্ত করার জন্য থাকে ইলিশ মাছ, খাসির মাংস, মিষ্টি আর দই।

তথ্যসূত্র :

১. অধ্যাপক অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তর্জালিক প্রতিবেদন।

২. লেখক চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর 'হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান।'

৩. লেখক আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস।'

পারিবারিক এক স্বজনোৎসব
‘জামাইষষ্ঠী’

আশিস কুমার বৈদ্য

বাঙ্গালির বারো মাসে তেরো পার্বণ আসলে জীবন রসের অমিয় ধারায় নতুন করে উদ্দীপিত হবারই আয়োজন। এসবের মধ্যে জামাইষষ্ঠীব্রত অন্যতম আকর্ষণীয় এক পারিবারিক তথা স্বজনোৎসব। এই উৎসবে বিবাহিতা কন্যা স্বামী-সহ পিতৃগৃহে আসেন। জামাইবাবাজির তুষ্টি বিধানে শ্বশুরপক্ষের তৎপরতাও লক্ষণীয়। আর মেয়ে-জামাই তো খালি হাতে আসেন না। ধর্মীয়, লৌকিক, পারিবারিক ঐতিহ্যের পরিমণ্ডলে, হাসি-তামাশা-গাম্ভীর্য ও আন্তরিক মেলবন্ধনে জামাইষষ্ঠী এক অনবদ্য অনুষ্ঠান। কেবল জামাইবাবাজীবনের হাতেই যে লাল-হলুদ সুতো বাঁধবেন পরম মঙ্গল কামনায়। মাথায় ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করবেন আর মিষ্টিমুখের ব্যবস্থার সঙ্গে সাধ্যমতো দ্বিপ্রাহরিক ভোজের আয়োজনও থাকবে। আগে শ্যালক-শ্যালিকা, শ্যালক-বধূদের সঙ্গে দল বেঁধে সিনেমা দেখার ধুম পড়তো, এখন এই পাট প্রায় নেই বললে চলে। আগরতলায় তো একেবারেই অচল। কারণ কোনো হলঘর নেই। এই ষষ্ঠীব্রত ক্ষেত্র বিশেষে নানা নামে প্রচলিত আছে, যেমন জামাইষষ্ঠী, অরণ্যষষ্ঠী প্রভৃতি।

> **জামাইষষ্ঠী কিংবা পুত্রষষ্ঠী, কন্যাষষ্ঠী কিংবা বধূষষ্ঠী যে নামেই হোক আসলে ষষ্ঠীব্রত একটি পারিবারিক, সামাজিক ও স্বজনোৎসব।**

কে এই ষষ্ঠীদেবী? কেনই-বা তাঁর আবাহন এবং পূজাপাঠ? ষষ্ঠীদেবী পৌরাণিক মাতৃকাদেবী। প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ রূপে পরিপূজ্যা বলেই তাঁর নাম ষষ্ঠীদেবী। পুরাণে তাঁকে দেব সেনাপতির অর্ধাঙ্গিণী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই তাঁর অপর নাম দেবসেনা। তিনি সন্তান বৎসলা মাতৃকাদেবী। সন্তানের কুশল কামনাতেই তাঁর পূজাপাঠ হয়। তাঁকে আবার তিনভুবনের ধাত্রী দেবী রূপেও বর্ণনা করা হয়েছে স্কন্দপুরাণ গ্রন্থে। শিশুর জন্মের ষষ্ঠদিনে তাঁর পূজা করলে শিশুর মঙ্গল হয়, একথাও স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে। পুরাণের আলোকে জানতে পারি, আদিকালে প্রিয়ব্রত নামে এক রাজা ছিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মার আদেশে তিনি পাণিগ্রহণ করলেও বহুকাল সন্তানহীন ছিলেন, কশ্যপ মুনির পৌরহিত্যে তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে সন্তান লাভ করেন। কিন্তু এই সন্তান জীবিত ছিল না। মৃত পুত্রকে সৎকারের জন্য শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হলো। সেই সময় স্বর্গলোক থেকে ষষ্ঠীদেবী অবতীর্ণ হয়ে শিশুটির প্রাণ দান করেন। রাজা কৃতজ্ঞচিত্তে ভক্তিভরে দেবীর পূজা করলেন। শিশুটির জন্মের ষষ্ঠ এবং একবিংশতি দিবসে তাঁর পূজা করা হলো। একথা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও লিপিবদ্ধ আছে।

মহাভারতেও ষষ্ঠীদেবীর কথা উল্লেখিত হয়েছে। মহাভারতের আদিপর্বে লেখা আছে ষষ্ঠীদেবীর মূর্তি ঘরে থাকলে গৃহাঙ্গন ধনধান্যে পরিপূর্ণ থাকে। কোনো কোনো পুরাণে আবার

ষষ্ঠীদেবীকে দেবসেনাপতির যত্ন আত্তিকারিণী মাতৃকাদেবী রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ইনি ষোড়শ মাতৃকাদেবীর অন্যতম। ষোড়শ মাতৃকাদেবীর মধ্যে ষষ্ঠীদেবী ছাড়াও আছেন গৌরীদেবী, পদ্মা, শচী, সাবিত্রী, স্বাহা, বিজয়া প্রভৃতি। ষষ্ঠী বেদ বহির্ভূতা পৌরাণিক দেবী। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তাঁর কথা উল্লেখ নেই। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের লেখা 'The Cult of Sasthi in Bengal' বইটিতে বলা হয়েছে, 'ষষ্ঠীদেবী চণ্ডী, মনসা ও শীতলাদেবীর ন্যায় 'আভিজাত্যহীন সমাজের মৃত্তিকায় পরিপুষ্টি লাভ করিয়া পরবর্তীকালে দুর্গার প্রকারভেদ রূপে অভিজাত সমাজে গৃহীতা হইয়াছেন। এই জন্য ষষ্ঠীদেবীর পূজা পদ্ধতি, মূর্তি পরিকল্পনা অভিজাত দেবকল্পনার সঙ্গে সম্পর্কহীন।' ষষ্ঠীদেবীর বাহন কালো বিড়াল। ইনি শিশুর রক্ষয়িত্রী দেবী। ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যে পাই তাঁর কৃপায় ছোটরানি সমস্ত চক্রান্ত জাল ভেদ করে পুত্রদের ফিরে পেয়েছেন। কবি শঙ্করের লেখা এই কাব্যে দেখা যায় দেবী সপ্তশিশু পরিবেষ্টিতা কল্যাণ স্বরূপিনী মাতৃমূর্তিতে আবির্ভূতা।

বৌদ্ধ ভাস্কর্য শিল্পেও সপ্তশিশু পরিবেষ্টিতা কুবের পত্নী হারীতী মূর্তির চমৎকার মূর্তি নির্মিত হয়েছে। দেবীর মুখমণ্ডলে বাৎসল্যের অপূর্ব লাবণ্যমণ্ডিত সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়েছে। চৈনিক পর্যটক ইৎসিনের বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে যে, হারীতীকে তিনি উত্তর ভারতের ধর্মীয় সংস্কৃতির অঙ্গনে সন্তানদায়িনী মাতৃকাদেবী রূপে দেখেছেন। উত্তর ভারত থেকেই বৌদ্ধদেবী হারীতী চীন দেশে গমন করেন। চীন ও জাপানে তিনি সন্তানদাত্রী মাতৃকাদেবী রূপে পরিপূজ্যা। বৌদ্ধ কাহিনিতে দেখা যায়, দেবী হারীতী পাঁচশত সন্তানের জননী। অবশ্য এই পঞ্চশত সন্তানের মধ্যে চারশত নিরানব্বইটি শিশুকে তিনি নিজেই হত্যা করেন। কনিষ্ঠ সন্তান পিঙ্গোলকে তিনি হত্যা করতে পারেননি। কারণ, ভগবান বুদ্ধ তাকে ভিক্ষাপাত্রে লুকিয়ে রেখে রক্ষা করেন। বুদ্ধদেবের কৃপায় তিনি সংবিৎ ফিরে পান এবং বুদ্ধদেবের শরণ গ্রহণ করে ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করেন। এসব কথা 'Gods of Northern Buddhism' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এতে বলা হয়েছে প্রথমদিকে সন্তান হরণ করার জন্যেই তাঁর নাম হারীতী হয়েছিল। পরবর্তীকালে বুদ্ধ করুণায় তিনি কল্যাণময়ী মাতৃকাদেবীতে রূপান্তরিত হন।

ষষ্ঠী মঙ্গলকাব্যে কবি শঙ্কর লিখেছেন, ষষ্ঠীদেবী অপুত্রককে পুত্র দান করেন। বন্ধ্যা নারীকে সন্তানবতী করেন। গান্ধার শিল্পকলাতেও তাঁর এই স্নেহশীলা মূর্তি অঙ্কিত হয়েছে। বৌদ্ধ গ্রন্থ ধম্মপদ অট্‌ঠকথার প্রথম খণ্ডে হারীতীর যক্ষিণী হবার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। কোনো পূর্বজন্মে তাঁর সন্তানকে হত্যা করা হয়েছিল। শোকোন্মাদিনী জননী পরবর্তীকালে সন্তানহরণকারিণী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধের দেশনা লাভ করে তাঁর মনোবৃত্তির সংশোধন ঘটে। বাংলা সাহিত্যে এই পথেই এসেছে অরণ্য ষষ্ঠীর কাহিনি। ষষ্ঠদেবীর নৈবেদ্য লোভের বশবর্তী ছোটো বউ খেয়ে ফেলেছিল। দোষ চাপিয়েছিল ষষ্ঠীর বাহন কালোবিড়ালের উপর। প্রতিশোধবশত সেই কালোবিড়াল এই বধূর ছয় সন্তান হরণ করে। ষষ্ঠীর কৃপায় অবশ্য বধূটি সন্তানদের ফিরে পান। বৌদ্ধ সাহিত্যে জলষষ্ঠীর কাহিনিটিও খুব চমৎকার। বাঙ্গলার লৌকিক দেবী 'জাতাপহারিণী', বৌদ্ধদেবী, হারীতী, জাতকমালার সঙ্গিনী, ষষ্ঠীমঙ্গলের ষষ্ঠীদেবী, পৌরাণিক মাতৃকাদেবীর মিশ্রণে বাঙ্গলার ষষ্ঠীদেবীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে। জামাইষষ্ঠী কিংবা পুত্রষষ্ঠী, কন্যাষষ্ঠী কিংবা বধূষষ্ঠী যেনামেই হোক আসলে ষষ্ঠীব্রত একটি পারিবারিক, সামাজিক ও স্বজনোৎসব। এই স্বজনোৎসবে আমাদের গৃহাঙ্গন আনন্দময় হয়ে উঠবে এটাই আমাদের একান্ত কামনা।

এই দিনে পণপ্রথার অন্ধকার, বধূহত্যার করুণ কাহিনি, প্রতাপশালী বধূ শাশুড়ি নির্যাতনের করুণগাথা, অসহায় শ্বশুরের শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থায় কেবলি কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ইত্যাকার বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে বসা হয়তো অনুচিত বিবেচিত হবে। কিন্তু ভাবনাগুলো যে মনের উপর চেপে থাকে। কিছুতেই ছুঁড়ে ফেলা যায় না। ষষ্ঠীব্রত আমাদের সামাজিক সমস্যাগুলোকে দূর করুক। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা, আশীর্বাদ, কল্যাণ কামনায় স্বজনেরা আরও কাছাকাছি এসে নিবিড় সম্পর্ক সূত্রে বাঁধা পড়বেন এটাই আমাদের একান্ত কামনা। আমরা বড়ো আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছি। সমাজ বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ছে। একান্নবর্তী পরিবারগুলো আর নেই। বাবা-মা'র কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে সন্তানেরা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাবা-মা'র চেয়ে শ্বশুর-শাশুড়ি ঢের বেশি গুরুত্ব পাচ্ছেন। ভ্রাতার চেয়ে শ্যালকের প্রতি কর্তব্য জ্ঞানের বহরও কম নয়। সমান চোখে দেখার দিন কি তবে শেষ? বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা বাড়ছে। সন্তানের বিদেশমুখিতায় ষষ্ঠীব্রত থাকবে কি? পুত্রবধূকে কন্যার মতো, শাশুড়িকে নিজের মায়ের মতো দেখার দৃষ্টান্ত অনেক, কিন্তু উলটো চিত্রও তো কম নয় এই পোড়া দেশে। কেবল এ দেশেই-বা কেন, প্রায় সব দেশেই আত্মসর্বস্বতা আমাদের স্নেহ, প্রীতি, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও আশীর্বাদের জায়গায় এক ধরনের ঔদাসীন্য জায়গা করে নিচ্ছে অতিদ্রুতবেগে। আমাদের আর্থ-সামাজিক সমস্যাদীর্ণ সময়ে মেলবন্ধনের উৎসব, স্বজনোৎসব ষষ্ঠীব্রতের উপযোগিতার কথা অনস্বীকার্য। ■

লোকায়ত পরম্পরার উৎসব জামাইষষ্ঠী

সুতপা বসাক ভড়

জামাইষষ্ঠী শব্দটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় প্রখর গ্রীষ্মের মধ্যেও একটি আনন্দঘন দিনের কথা। সকালের দিকে পুজোআর্চা ছাড়াও ওইদিন বাড়িতে পুরুষদের বাজারের ব্যস্ততা এবং মহিলাদের রন্ধন নৈপুণ্যের প্রকাশ দেখতে পাই। সাধারণত জামাইষষ্ঠীর কয়েকদিন আগে জামাইকে নেমন্তন্ন করা হয়। জামাই বাবাজীবন তা স্বীকার করে ওই বিশেষ দিনে সপত্নীক শ্বশুরবাড়ি আসেন।

এখন প্রশ্ন হলো জামাইষষ্ঠী কেন পালন করা হয়। আমাদের সমাজজীবনে অনেক লৌকিক দেব-দেবী বিশেষ মাহাত্ম্য পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতমা হলেন মা-ষষ্ঠী। প্রচলিত বিশ্বাস মতে তিনি হলেন সন্তানদাত্রী দেবী। বঙ্গপ্রদেশে সাধারণত ষষ্ঠীদেবীর নির্দিষ্ট কোনো প্রতিমা দেখা যায় না। 'ষষ্ঠীর থানে' তিনি পূজিতা হন। 'থান' শব্দটি এসেছে স্থান থেকে। সুতরাং, উর্বরতা দেবীরূপেও তিনি পূজিতা হন। কালক্রমে জামাই আদর আপ্যায়নের সঙ্গেও তাঁর নাম জুড়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গে সারা বছর ধরে ষষ্ঠীর ব্রত পালন হলেও, এগুলির মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় হলো দুর্গাষষ্ঠী এবং জামাইষষ্ঠী বা অরণ্যষষ্ঠী। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে জামাইষষ্ঠী পালিত হয়। সেই সময় থেকেই বঙ্গপ্রদেশে জামাইষষ্ঠীর প্রচলন হয়। এই লোকচার জামাইয়ের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির সম্পর্ক সুমধুর করে তোলে। শাশুড়িমাতা জামাইকে নিজ সন্তানরূপে মেনে, তার মঙ্গল কামনায় এই ব্রত পালন করেন। এর সঙ্গে মা-ষষ্ঠীর কাছে নিজ সন্তানের (মেয়ের) মাতৃত্ব কামনা করেন।

আগেকার দিনে বিবাহিতা কন্যা সন্তানবতী না হওয়া পর্যন্ত মা-বাবা মেয়ের শ্বশুরবাড়ি যেতেন না। আবার অনেক সময় সন্তান ধারণ সমস্যা বা সন্তান-মৃত্যু (শিশুমৃত্যু) জনিত কারণে তাঁরা মেয়েকে দীর্ঘদিন দেখতে পেতেন না। সমস্যা সমাধানের জন্য জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতিথিকে বেছে নেওয়া হয় জামাইষষ্ঠী রূপে। ওইদিন মেয়ে- জামাইকে নেমন্তন্ন করে যত্নআত্তি করা হয় এবং মেয়ের সন্তানবতী হবার আকাঙ্ক্ষায় মা-ষষ্ঠীর কৃপা প্রার্থনা করা হয়ে থাকে।

সবমিলিয়ে মা-ষষ্ঠীর পূজা পালনের সঙ্গে কিছু লোককথাও যুক্ত আছে। অনেক বছর আগে একটি সংসারে দুটি বউ ছিল। তাদের মধ্যে ছোটো বউটি ছিল লোভী। বাড়িতে সুস্বাদু রান্না হলে সব নিজে খেয়ে শাশুড়িকে বলত, 'সব কালো বেড়ালে খেয়ে নিয়েছে।' বেচারি বেড়াল এই ঘটনা মা-ষষ্ঠীকে জানায়। দেবী তখন রেগে গিয়ে ছোটোবউয়ের একটি একটি করে সাতটি পুত্র এবং একমাত্র মেয়েকে নিজের কাছে ফিরিয়ে নেন। এদিকে অলক্ষ্মী বলে বাড়ির লোকজন ছোটোবউকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। মনের দুঃখে ছোটোবউ বনে গিয়ে থাকে। এদিকে মা-ষষ্ঠী বৃদ্ধার ছদ্মবেশে এসে তার দুঃখের কারণ জানতে চান। ছোটোবউ সব ঘটনা খুলে বলে। তখন ষষ্ঠী ঠাকুরণ তার ভুল ব্যবহারের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং ভক্তিভরে ষষ্ঠীপূজা করতে বলেন। তাঁর নির্দেশ পালন করলে ছোটোবউ তার সাত ছেলে ও এক মেয়েকে ফিরে পায়। চারদিকে এই কথা ছড়িয়ে পড়ে। এই হলো জামাইষষ্ঠী

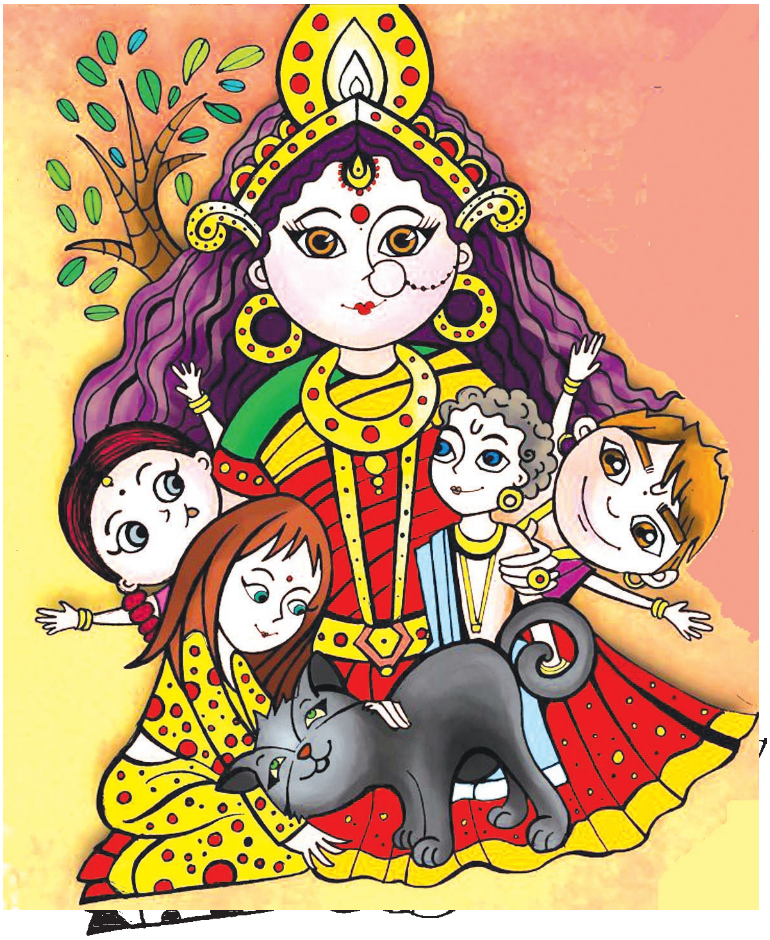

ব্রতকথার মূল গল্প।

ওইদিন শাশুড়িরা জামাইয়ের কপালে দইয়ের ফোঁটা দিয়ে আশীর্বাদ করেন। দীর্ঘজীবন কামনায় মা-ষষ্ঠীর চিহ্নরূপে হলুদে রাঙানো সুতো হাতের কবজিতে বেঁধে দেন। জামাইকে ফল, মিষ্টি, ভাত, লুচি, রকমারি রান্না ইত্যাদি দিয়ে আপ্যায়ন করেন। জামাইও দই-মিষ্টি, প্রণামি দেন। শাশুড়ি জামাইকে ধুতি অবশ্যই দেন।

সকালের পূজাপদ্ধতি মোটামুটি এইরকম— কাঁঠাল পাতায় সাজানো হয় ৫, ৭ অথবা ৯ রকমের ফল। শাশুড়িরা স্নান করে ঘটে জল নিয়ে তার ওপর রাখেন আম্রপল্লব এবং সঙ্গে থাকে তালপাতার পাখা। একটি সুতোতে হলুদ মাখিয়ে তাতে ফুল, বেলপাতা দিয়ে গিঁট বেঁধে রাখেন। এবার ওই ডালি নিয়ে মা-ষষ্ঠীর থানে পুজো দিয়ে আসেন। জামাই এলে ওই দূর্বার গোছা ঘটের জলে ভিজিয়ে তালপাতার সঙ্গে ধরে মেয়ে-জামাইকে হাওয়া করেন। পাখার হাওয়া দিয়ে 'ষাট-ষাট-ষাট' বলে ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেন। পূজার উপকরণগুলি এইরকম— তালপাতার পাখা, ধান, দূর্বা, আম্রপল্লব, পাঁচ-সাত বা ন'রকম ফল, ফুল, বেলপাতা, সাদা সুতো ও হলুদ সুতো। ফলের মধ্যে অবশ্যই করমচা থাকবে। 'ষাট-ষাট' কথাটি 'বালাই-ষাট' থেকে এসেছে। জামাইয়ের মঙ্গল কামনায় এই কথা বলা হয়।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরিবারের জামাইষষ্ঠী ছিল বিখ্যাত। আবার ভগবানকেও আমরা পুজো করি জামাই রূপে। নবদ্বীপের মহাপ্রভু মন্দিরে জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্ল পক্ষে পালিত হয় জামাইষষ্ঠী। এই মন্দিরের সেবায়েতরা হলেন বংশপরম্পরায় নিমাই-পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার ভাইদের উত্তরপুরুষ। তাঁরা দীর্ঘকাল ধরে এই তিথিতে শ্রীচৈতন্যদেবের বিগ্রহকে জামাইরূপে আপ্যায়ন করেন। স্থানীয় বয়স্কা মহিলারা তাঁকে ষাটের বাতাস দেন। হাতে হলুদ সুতো পরিয়ে দেন। সেদিন বিগ্রহের পরনে থাকে নতুন পোশাক আর থাকে রাজসিক ভোগের আয়োজন। রুপোর গ্লাসে জল, রুপোর রেকাবিতে ফল, রুপোর বাটিতে ক্ষীর দিয়ে মহাপ্রভুর ঘুম ভাঙানো হয়। এরপর ফলাহারে থাকে চিড়ে, মুড়কি, আম, কাঁঠাল, দই, মিষ্টি। দুপুরের ভোজে ডাল, ভাজা, থোড়, ছানার ডালনা, বেগুন পাতুরি, লাউ, চালকুমড়ো, ধোকা ইত্যাদি নিরামিষ ব্যঞ্জন। এরপর দিবানিদ্রা। বিকেলে উত্থানভোগে থাকে ছানা ও মিষ্টি। রাতে শয়ানের আগে মালপোয়া, রাবড়ি ও গাওয়া ঘিয়ের লুচি। শেষে থাকে সুগন্ধিত খিলি পান। এই মন্দিরের জামাইষষ্ঠী ভোগের বিশেষ পদ হলো আমক্ষীর।

জামাইবাবুদের সঙ্গে শ্যালক-শ্যালিকাদের রসিকতাও চলে। জামাইয়ের সঙ্গে মশকরা করার জন্য এক শাশুড়ির নির্দেশের হুগলির সূর্য মোদক বানিয়েছিল জলভরা তালশাস সন্দেশ। নতুন মিষ্টিতে কামড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় রসে মাখামাখি হয় হাত ও নতুন পাঞ্জাবি।

জামাইষষ্ঠীর অনুষ্ঠানের আচরণগুলো বিশেষ অর্থ বহন করে। যেমন ফুল, বেলপাতা দিয়ে বাঁধা সুতো দুটো পরিবারের এবং মেয়ে-জামাইয়ের মধ্যে অটুট বন্ধন থাকে। পাখা দিয়ে হাওয়া করে সব বিপদ-আপদ দূর করে পরিবেশ শান্ত রাখা হয়। তিনবার 'ষাট-ষাট-ষাট' বলে জামাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। ধান হলো সমৃদ্ধি ও সন্তানাদির প্রতীক। দূর্বা চির সবুজ। এছাড়া জামাইষষ্ঠীর জন্য বাজারে কেনাকাটাও ভালো হয়। এই বছর ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ (২৫.৫.২০২৩) জামাইষষ্ঠী পড়েছে। শুভকামনা রইল মেয়ে- জামাইদের এবং পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি। লোকায়ত এই পরম্পরা রক্ষার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের। □

মন কী বাত একশো

নানা কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকলো প্রধানমন্ত্রীর 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানের শততম পর্ব। সেই সুদূর আমেরিকায় নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদর দপ্তর থেকে সরাসরি সম্প্রচার হলো। ৩০ এপ্রিল ১১টি বিদেশি ভাষায় সম্প্রচারিত হলো 'মন কী বাতের শততম পর্ব। স্মরণীয় ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মন কী বাত অনুষ্ঠান কোনও কর্মসূচি নয়, এটা বিশ্বাস, পুজোর মতো পবিত্র। মন কী বাতের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সফর করছি। বহু মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরেছি। মন কী বাতের মাধ্যমে একের পর এক গণআন্দোলন গড়ে উঠেছে। আমার কাজে জনতাই ঈশ্বর। মন কী বাতে তাঁদের কথা উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি আমরা।'

২০১৪ সালের ৩ অক্টোবর বিজয়া দশমীর দিন 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয়। প্রতি মাসে প্রধান মন্ত্রী দেশ ও সমাজ কল্যাণ বিষয়, ভারতবর্ষের গর্ব করার মতো বিষয়, দেশের সমস্যা ও নাগরিকদের সুখ, দুঃখ নিয়ে আলোচনা দেশবাসীর সঙ্গে করে এসেছেন। নিঃসন্দেহে তাঁর মন কী বাত অনুষ্ঠানটি অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে দেশের সাধারণ মানুষকে। তাঁর ভাষণে কখনো উঠে এসেছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষচন্দ্র বসু, বারুইপুরের সাইদুল নস্কর, হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদ, পদ্ম সম্মানে ভূষিতা সুভাসিনী মিস্ত্রীর মতো দিকপাল মানুষের কথা। মোদীজীর 'মন কী বাত অনুষ্ঠানে ঠাঁই পেয়েছিল ত্রিবেণী কুম্ভ মহোৎসবে, দশহারা, দীপাবলী, ছটপূজা এবং প্রত্যন্ত সুন্দরবন জঙ্গলে মধু সংগ্রহকারী সাধারণ মানুষের কথা।

শততম পর্বে দেশের নারীশক্তি প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'সেনাবাহিনী হোক বা খেলাধুলা, দেশের মেয়েরা বহু ক্ষেত্রেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।' প্রসার ভারতী সূত্রের খবর অনুযায়ী, সম্প্রতি হরিয়ানার রোহতকের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের করা এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, 'দেশের ৯৬ শতাংশ মানুষ প্রধানমন্ত্রীর 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানের কথা জানেন। পাশাপাশি আরও বলা হয়েছে, যে দেশের ১০০ কোটি মানুষ অন্তত একবার হলেও 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানটি শুনেছেন। দেশের প্রায় ৩২ কোটি মানুষ অনুষ্ঠানটি নিয়মিত শুনে থাকেন। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, দেশের ৭৩ শতাংশ মানুষ প্রধানমন্ত্রীর এই কর্মসূচিতে খুশি। দেশের ১৯ থেকে ৩৪ বছর বয়সি শ্রোতাদের সংখ্যা ৬২ শতাংশ। নিঃসন্দেহে বলা যায় অনুষ্ঠানটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে সারাদেশে। আজ যদি বলা হয় প্রধানমন্ত্রীর 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানটি এক জাতীয় কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে, তাহলে ভুল বলা হবে না।

—**সঞ্জীব দে,**
আন্ধেরি ইস্ট, মুম্বাই।

মন কী বাত এবং জন-আন্দোলন

প্রধানমন্ত্রীর 'মন কী বাত' শততম পর্বে পৌঁছল। তিনি প্রধানমন্ত্রী হবার পর কর্মব্যস্ততার কারণে আগের মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতেন না। ৩ অক্টোবর ২০১৪ সালে তিনি প্রথম রেডিয়োতে মন কী বাতের অনুষ্ঠানে আসেন। তিনি দেশের জনগণের কাছে তার এই অনুষ্ঠানের জন্য তাদের মনের কথা লিখতে বলেন। প্রচুর মানুষ জাত, ধর্ম, বর্ণকে উপেক্ষা করে, প্রধানমন্ত্রীকে পত্র লিখতে শুরু করেন। তার মধ্যে বিশেষ ভাবে সাড়া জাগানো চিঠি প্রধানমন্ত্রী লোকশিক্ষা ও জন-আন্দোলনের জন্য পড়ে শোনাতেন। দেশের সব প্রান্তের মানুষ থাকতেন তাদের মধ্যে।

যেমন ছিলেন হরিয়ানার সুনীল জারলান্ড, মণিপুরের বিজয় শান্তি দেবী, জম্মু কাশ্মীর রাজ্যের মনজুর আহমেদ, গুরুগ্রামের প্রদীপ সাঙ্গওয়ান প্রভৃতি। এরা প্রত্যেকেই নিজের প্রচেষ্টায় অসাধারণ কাজ শুরু করে দেশ ও দেশের মানুষের উপকার করছেন। কেউ পদ্ম ডাটার ছাল তুলে এবং তার সুতো দিয়ে বস্ত্র তৈরি করেছেন। কেউ-বা হিমালয়ের পাহাড়ে পড়ে থাকা জলের বোতল, প্লাস্টিক বর্জ্য, পানিয়োর ধাতব ক্যান তুলে বস্তাবন্দি করে রি-সাইকেলের জন্য পাঠাতেন। মহিলা ও নারী সশক্তিকরণের কাজ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মহিলারা নিজের চেষ্টায় করছিলেন। তাদের খবর জানার পর মন কী বাতের অনুষ্ঠানে তাদের হাজির করে উৎসাহ দেন। এই খবর দেখে অনেকেই তাদের সাহায্য করে। তারা আজ শত শত লোকের কর্মসংস্থানের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠেছেন। হরিয়ানার সুনীলজী তার মেয়ের সঙ্গে সেলফি তুলে পাঠানোর পর মোদীজী বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি গ্রহণ করেন। সেদিনের সেই সুনীলজীর মেয়ে প্রধানমন্ত্রীর অনুপ্রেরণা পেয়ে আজ বিদেশে পড়াশোনা করছে। এই ভাবে মন কী বাত সঠিক মানুষের সহায়তায় আজ জন-আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

সব সময় সব কিছুতেই কিছু মানুষের রাজনীতি দেখার অভ্যাস আছে। একই ফুল থেকে মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে আবার মাকড়সা ওই ফুল থেকে বিষ নেয়। এটা যেমন মধু ও মাকড়সার ব্যাপার, ঠিক তেমনি আমাদের সমাজে আমাদের মধ্যে কেউ মৌমাছি আবার কেউ মাকড়সার মতো। তাইতো একই মন কী বাত অনুষ্ঠানে কেউ হয় উপকৃত আর কেউ উপকৃত না হতে পেরে হয় ক্রুদ্ধ। আমাদের রাজ্যের এক ট্যাক্সিচালক শহিদুল লস্কর নিজের বোনের অকাল মৃত্যুর পর নিজের চেষ্টায় এক হাসপাতাল তৈরি করেন তার বোনের স্মৃতিতে। তাকে রাজভবনে আমন্ত্রণ করা হয়। ইতিপূর্বে মোদীজী তার মহৎ প্রচেষ্টা ও অদম্য জেদের কথা মন কী বাত অনুষ্ঠানে তুলে ধরেছেন। গতকাল তিনি তার মনের মতো কাজ না হওয়ার কারণে তাকে দেওয়া উত্তরীয় রাজভবনে গিয়ে ফেরত দিয়েছেন। সেই ছবি সংবাদপত্রে ছেপে জানি না তাকে হিরো বানানো হলো না জিরো বানানো

ফঃ ৩

হলো। নরেন্দ্র মোদীকে প্রশ্নের মুখে ফেলতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রশ্নের মুখে ফেললেন। এখানে তো একটা সরকার আছে? বলি তারা কি শহিদুল লস্করকে সাহায্য করতে পারতো না? তাদের কি শুধু চাকরি বিক্রি করাটাই কাজ? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই তো স্বাস্থ্য মন্ত্রী। এই দায় তো তারও। তবে এটা ঠিক আজ কয়েকটি সংবাদপত্রে যে ভাবে বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে তাতে স্পষ্ট মোদীজীর বিরুদ্ধে যারা, তারা এই সফল ১০০তম মন কী বাত অনুষ্ঠান দেখে ভীষণ ভয় পেয়েছে।

—**শ্যামল কুমার হাতি,**
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

গুজরাট হাইকোর্ট ফের ধাক্কা রাহুলের

আজ বিরোধী জোটের পরপর দুই জট। প্রথম জট যদি হয় গুজরাট হাইকোর্টে রাহুলের ফের হার, দ্বিতীয়টি হলো, এনসিপি থেকে শরদ পাওয়ারের পদত্যাগ। বিড়ম্বনা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না রাহুলের। এমনকী যে মহার্ঘ্য আইনজীবীর সওয়ালে মাত্র দুটি দুর্নীতি বিষয়ক মামলা কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চ থেকে সরলো আজ সেই আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি নিজের তত্ত্বাবধানে লড়াই করেও জেতাতে পারলেন না তাঁর নেতাকে। অনেক কূট যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন, কিন্তু বিচারপতির মন গলেনি তাতে। তাঁর যুক্তি ছিল অভিযোগকারী বিজেপি নেতা পূর্ণেশ মোদী নাকি প্রথম থেকে মোদী সমাজভুক্ত নন। পরে তিনি নাকি মোদী সমাজভুক্ত হয়েছেন। এমন কুযুক্তির সঙ্গে সহমত হননি একক বেঞ্চের বিচারপতি।

তাই তিনি একই যুক্তি দিয়েছেন যা আগের দুই নিম্ন আদালতের বিচারকরা বলেছেন। রায় যে রাহুলের বিপক্ষে যাচ্ছে তা বিচারপতি আগের দিনের পর্যবেক্ষণে বলেছেন। এখন রাহুলের রক্ষাকবচ দিতে পারে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ এবং শীর্ষ আদালত। কিন্তু সেখানেও যে রক্ষাকবচ মিলবে তার নিশ্চয়তা কি দিতে পারবেন সিঙ্ঘভিজী। হাইকোর্টের এই ধাক্কা বিরাশি সিক্কার ধাক্কা দুজনের কাছে। এদিকে নিম্ন আদালতের জামিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার মুখে। এ অবস্থায় হাতে সময় নেই। তাই ডিভিশন বেঞ্চ এড়িয়ে সুপ্রিম কোর্টের আবেদন করবেন রাহুল। রিপাবলিক টিভি চ্যানেলের এক অনুষ্ঠানে মোদীজী উল্লেখ করলেন যে, কংগ্রেস নেতারা তাঁকে একানব্বইবার বিভিন্ন মঞ্চ থেকে কু-কথা বলেছেন। এক রাহুল থেকে শিক্ষা নেয়নি দল। মোদীজী এই তথ্যটি পেয়েছেন তাঁর এক ভক্তের কাছে। মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া যায় এ যাত্রায় রাহুলের জেলযাত্রা ঠেকানো যাবে না। তবু শিক্ষা নেননি মল্লিকার্জুন খাড়্গে। তিনি কর্ণাটকের এ নির্বাচনী জনসভা থেকে মোদীজীকে বিষধর সাপ বলে গালি দিয়েছেন। অবশ্য জুতো মেরে গোরু দানের মতো ক্ষমাও চেয়েছেন। অতীতে সোনিয়া গান্ধী মওতকী সওদাগর বলে গালি দিয়েছেন মোদীকে এবং আরেক নেতা নীচ বলেও গালি দিয়েছেন। কিন্তু কোনো গালি মোদীজীর অপ্রতিরোধ্য গতিকে প্রতিহত করতে পারেনি। অতীতের ভুল থেকে নেতারা কেন শিক্ষা নেন না সেটাই ভাবার বিষয়।

—**তারক সাহা,**
হিন্দমোটর, হুগলী।

ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই

না, হিন্দুরা স্থির করেছে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে তারা কোনও শিক্ষা নেবে না। ৭০০ বছর বিদেশি বিধর্মীদের দ্বারা অত্যাচারিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত, উৎপীড়িত এবং ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়েও হিন্দুরা ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে কোনও শিক্ষা গ্রহণ করেনি। হিন্দুরা এখনও বিশ্বাস করে চলেছে 'ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই'। বিধর্মী তৈমুরলং দিল্লি আক্রমণ করার আগের রাত্রে এক লক্ষ বন্দি নিরস্ত্র হিন্দুকে হত্যা করেছিল। হিন্দুর রক্তে যমুনার জল লাল হয়ে গিয়েছিল, হিন্দু মৃতদেহে যমুনার জলস্রোত বনধ হয়ে গিয়েছিল। এতে করে কী মঙ্গল হয়েছিল জানা নেই।

আফগানিস্তানের অধিপতি সুলতান মামুদ শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরা এবং বাল্যের লীলাভূমি বৃন্দাবন তছনছ করেছিল। হিন্দুর রক্তে মথুরা বৃন্দাবনের মাটি কর্দমাক্ত হয়েছিল হিন্দু রমণীদের গজনির দাসবাজারে তাদের নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রী করে দিয়েছিল সম্ভ্রান্ত ঘরের ওই হিন্দু মহিলাদের। এতে কার কী মঙ্গল সাধিত হলো আমার বুদ্ধির অগম্য। সুলতান মামুদ একাধিকবার গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরে আক্রমণ চালিয়ে বাবা সোমনাথের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা ৫০ হাজার সাধু সন্ন্যাসী এবং ভক্তকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। শুধুমাত্র এই নয়। বাবা সোমনাথের বিগ্রহটি ভেঙে টুকরো টুকরো করে গজনি নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন মসজিদ এবং প্রাসাদের সিঁড়িতে প্রোথিত করা হয়েছিল যাতে সেগুলি নিয়মিতভাবে পদদলিত করা যায় আল্লাহতালার সেবকবৃন্দের দ্বারা। কত কোটি টাকার স্বর্ণমুদ্রা ও সম্পদ লুণ্ঠিত হয়েছিল এই মুহূর্তে আমার পক্ষে বলা সম্ভব হচ্ছে না অজ্ঞতার কারণে। তবে এই সমস্ত কারণে কার কী মঙ্গল সাধিত হয়েছিল আমার জ্ঞানের পরিসীমার বাইরে। অথচ হিন্দুরা এখনও বিশ্বাস করে চলেছে 'ঈশ্বর যা করেন সব মঙ্গলের জন্যই করেন।'

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান
গ্রাহক হোন, গ্রাহক করুন

আজও বাল্যবিবাহ চলছে আইনের আড়ালে

মিতা রায়

ইদানীংকালে নারীর নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে বেশ কিছু আইন পাশ হয়েছে, যাতে মহিলারা নিরাপদে থাকতে পারে, তাদের ওপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া না হয়— তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ যেন গড়ে উঠতে পারে। নারী সুরক্ষা আইনে মহিলামহলে এক স্বস্তির নিঃশ্বাস, আশ্বস্ত হওয়ার বিশ্বাস জেগেছিল। কিন্তু এত বড়ো রাজ্যে কোথায় কী ঘটছে তা কি সবাই জানতে পারে বা জানলেও কি তার কোনও সুবিচার হয়? হয় না। না হলে শিউরে ওঠার মতো নাবালিকা মেয়েদের ওপর এত বড়ো নির্মম অত্যাচার চালাতে পারে গ্রামের মানুষজন! অত্যাচার তো বটেই, নিজস্ব স্বাধীনতাকে পিষে মেরে জোর করে বিয়ে দিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া মানেই তো গলা টিপে মেরে ফেলা। মানবিকতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পড়াশোনা শিকেয় তুলে কত নাবালিকাকে বিয়ের পিঁড়িতে জোর করে বসাচ্ছে তাদের বাবা-মা তার হিসাব কেউ রাখে না। কিছুদিন পর অর্থাৎ বছর ঘুরতে না ঘুরতে বালিকা কন্যার রূপান্তর ঘটে মা'র ভূমিকায়। তখন তার একমাত্র কাজ হয় সন্তান পালন ও সংসারের ঘানি টানা। ভবিষ্যতের সব স্বপ্ন শেষ হয়ে যায়। অভিভাবকরা নিরক্ষর হলেও এই সুসভ্য সমাজে যে তাদের বাবা-মা'দের সমাজের বিচক্ষণ মানুষরা বোঝাবেন এবং বাল্যবিবাহ আজকের দিনে কঠোর অপরাধ— শুধু তাদের ভবিষ্যতের পড়াশোনা বন্ধের জন্য নয়, আঠারো বছরের আগে সন্তান ধারণ তার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। তাঁরাই যদি সব জেনেও মদত দেন, তাহলে অভিভাবকদের অপরাধ কোথায়? অভিভাবকদের একটাই কথা— মেয়ে হয়ে জন্মেছে যখন বিয়ে তো দিতেই হবে। ভালো ছেলে পেলে কেন বিয়ে দেব না! আসলে তাদের অভিধানে মেয়েদের জীবনে 'বিয়ে' হল শেষ কথা।

২০১৩ সালে একটি লোমহর্ষক ও

নৃশংস ঘটনা খানাকুলের পোল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁটাপুকুর গ্রামে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রওশনারা বেগম মাধ্যমিকের আগে বিয়ে করতে রাজি নয়, তাই বাবা-মা'র ঠিক করা পাত্রের সঙ্গে বিয়েতে নারাজ হওয়ায় তাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেছিল বাবা-মা ও ঠাকুমা। ঘটনাটি মুসলমান পরিবারে। পাড়াপ্রতিবেশী থানায় গিয়ে অভিযোগ জানায়। নারী সুরক্ষা আইন তৈরি হচ্ছে, অথচ নারীরা আজও নিরাপত্তার অভাবে ভুগছে। তবে বীণা কালিন্দীদের মতো কিছু নির্ভীক কন্যা বাবা-মা'র পছন্দ করা পাত্রের সঙ্গে বিয়ের আসন থেকে উঠে এসে সোজা থানায় গিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিল। তাদের স্বপ্নকে চুরমার করতে বাবা-মা যে অন্যায় করছিল, তার প্রতিবাদ করতে তারা এতটুকু বিচলিত হয়নি। তাই তো তৎকালীন মহিলা রাষ্ট্রপতি অসমসাহসী ক'জন কন্যাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সংবর্ধিত করেছিলেন। কিন্তু সেই বীণা কালিন্দীও শেষমেষ পারল না তার জেদ ধরে রাখতে। আসলে সমাজের অনুশাসনে সেও বিয়ের আসনে বসতে বাধ্য হয়েছিল। জানি না তার জীবনের পরিণতি আজ কোথায় নিয়ে গেছে? সমাজে একটা সময়ে শিক্ষার আলো এসে যখন পড়েনি তখন মেয়েদের জীবনে 'বিয়ে' ছাড়া কিছুই ছিল না। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতিতে সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে মেয়েরা এগিয়ে গেছে। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতেও গ্রামের মেয়েদের ওপর এহেন নির্বিচারে অবদমন কি চিন্তা করা যায়! তবে এটা ঠিক যে, সমাজের, ওপরতলার কর্তাব্যক্তিরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মোড়লি করতে গেলেও আজও কিছু প্রকৃত শিক্ষিত মানুষের উদারদৃষ্টিতে ধরা পড়ছে এই অন্যায় অবিচার এবং তাঁদের নেতৃত্বে তুলে ধরা হচ্ছে এহেন করুণ ঘটনা। তাঁদের মধ্যে বীরভূম জেলার নওগাঁ বিলসা উচ্চবিদ্যালয়ের ইতিহাসের সংলাপ বিশ্বাস। ভাবলেও দুঃখ হয় যে, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সমাজের কুপ্রথা-সংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশব সেনের মতো সমাজ সংস্কারকরা, আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন বাল্যবিবাহ-র মতো কু-প্রথাকে বন্ধ করার জন্য। কিন্তু স্বাধীনোত্তর পর্বে একবিংশ শতাব্দীর মতো সময়ে তলে তলে চলছে বাল্যবিবাহের হিড়িক শিক্ষিত সমাজে।

সংলাপ বিশ্বাসের মতো এই বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষকরা সম্মিলিতভাবে অজ্ঞ, অশিক্ষিত অভিভাবকদের বাল্যবিবাহের কুফল বোঝানোর জন্য কর্মশালার ব্যবস্থাও করেছেন। তাঁদের কাছ থেকে মতামত নিয়েছেন। কিন্তু অজ্ঞতার অন্ধকারে থাকা অভিভাবকদের একটাই কথা— চিরদিনই এইভাবে চলে এসেছে। আমাদের সংসারে যারা অল্পবয়সে বিয়ে হয়ে এসেছে বা যাদের অন্য পরিবারে বিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা কি কেউ খারাপ আছেন! প্রকৃত অর্থে, যে যতই বোঝাক না কেন, প্রশাসনিক স্তর থেকে যদি সচেতন করার চেষ্টা না থাকে, তাহলে এরা অন্যের কথা মানবে কেন? দুঃখ একটাই, আমরা একদিকে পা ফেলে এগোচ্ছি বটে, কিন্তু মনের দিক থেকে এক পা পিছনে হাঁটছি। □

মা হওয়ার আগে পরীক্ষানিরীক্ষা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

মা হওয়ার আগে সন্তানের সুস্থ জন্মদান সুনিশ্চিত করতে জরুরি কিছু পরীক্ষার। শুধু সন্তানই নয়, যে মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছেন, সেই মায়ের সুস্থতাও নিশ্চিত করা জরুরি। নির্বিঘ্ন প্রেগন্যান্সি তবেই সম্ভব।

প্রাথমিক পরীক্ষা ও প্ল্যানিং : ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার অর্থাৎ গর্ভাবস্থার একদম শুরুর দিকে কয়েকটি জরুরি পরীক্ষা প্রথমেই করিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। তার মধ্যে প্রধান হলো বিভিন্ন ধরনের রক্তপরীক্ষা। কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট পরীক্ষার মাধ্যমে ব্লাড সেল, প্লেটলেট কাউন্ট ইত্যাদি নির্ণয় করা হয়। গর্ভধারণ করার সময় অ্যানিমিয়া হচ্ছে কি না তা জানা জরুরি। হিমোগ্লোবিনের মাত্রা, আয়রনের মাত্রা ইত্যাদি নিয়মিত পরীক্ষা করাতে হবে। এসজিপিটি-র মাত্রা কত, তাও খতিয়ে দেখা হয়। এছাড়া মায়ের সুগার লেভেল, প্রেশার লেভেল নিয়মিত পরীক্ষা করানো দরকার। কারণ অন্য সময়ে প্রেশার বা সুগার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকলেও গর্ভাবস্থায় তা ওঠানামা করে অনেকেরই। অনেকের এ সময়ে থাইরক্সিন হরমোনের মাত্রা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। সুগারের মাত্রা বেড়ে জেস্টেশনাল ডায়াবেটিসের শিকারও হয়ে থাকে অনেক মহিলাই। গ্লুকোজ চ্যালেঞ্জ টেস্ট করা হয়। চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ খেয়ে থাইরয়েড, সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার।

শুধু গর্ভধারণের পরেই নয়, এর প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করা দরকার সন্তান গর্ভে আসার আগেই। রুবেলা ভ্যাকসিন-সহ আও বেশ কিছু সাবধানতা নেওয়া দরকার কনসিভ করার আগে। এইচআইভি স্ক্রিনিং, সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন হওয়া জরুরি সময় থাকতেই। গর্ভে সন্তান আসার পরেও তাকে সুস্থ ভাবে ধারণ করতে আপনার শরীর প্রস্তুত কি না, তাও খতিয়ে দেখা দরকার। গাইনিকোলজিস্ট ডাঃ অভিনিবেশ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'অ্যান্টিনেটাল টেস্ট প্রেগন্যান্সির খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গর্ভাবস্থায় পুরো সময়টা ধরে মা ও গর্ভস্থ শিশুর সুস্থতা বজায় রাখতে এই পরীক্ষাগুলি খুবই জরুরি। নানা ধরনের ইউরিন টেস্ট, ব্লাড টেস্ট, আল্ট্রাসাউন্ড টেস্টের মাধ্যমেই আমরা অনেক বিষয়ে আগে থেকে নিশ্চিত হতে পারি।'

সন্তানের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করুন : আপনার গর্ভে থাকা ভ্রূণ যখন একটু একটু করে বেড়ে উঠছে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ কি না বা তার কোনও জটিলতা তৈরি হচ্ছে কি না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া বিভিন্ন উপায় রয়েছে। চিকিৎসকরা এর জন্য একাধিক আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্রিনিঙের সাহায্য নিয়ে থাকেন। শিশুর ক্রোমোজোমাল ডিফেক্ট বা ডাউন সিনড্রোমের সম্ভাবনা আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হয় ডাবল মার্কার টেস্টের মাধ্যমে। গর্ভাবস্থা আরও পরিণতির দিকে এগোলে সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে ফেটাল ইকোকার্ডিয়োগ্রাফি করে দেখা হয় শিশুর হৃদ্‌যন্ত্র ঠিক মতো কাজ করে কি না। এটিও এক ধরনের আল্ট্রাসাউন্ড পরীক্ষা। প্রতি ট্রাইমেনস্টারই একাধিক ইউএসজি করে গর্ভস্থ শিশুর গতিবিধি ও বেড়ে ওঠা পর্যবেক্ষণ করা হয়। গর্ভাবস্থা পাঁচ মাস পেরোলে (২০ সপ্তাহ পরে) একটি ডিটেলড অ্যানোমালি স্ক্যান করা হয়। এতে বেড়ে ওঠা ভ্রূণের আয়তন, ওজন, মস্তিষ্কের বৃদ্ধি, স্পাইনাল কর্ড ও অন্যান্য হাড়ের গঠন, হৃদ্‌স্পন্দন-সহ আরও বেশ কিছু অ্যানাটমিক্যাল বৈশিষ্ট্য বিশদে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। কোনো জটিলতা তৈরি হলে সেটিও এই আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানে ধরা পড়ে ও সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়। শুধু শিশুই নয়, মায়ের পেলভিক এরিয়া, প্লাসেন্টা, অ্যামনিয়োটিক ফ্লুয়িড ইত্যাদির বশদ চিত্রও দেখা সম্ভব এই পরীক্ষায়। এই অ্যানোমালি স্ক্যানটি তাই খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ভ্যাকসিনেশন ও সুরক্ষা : প্রেগন্যান্সি প্ল্যানিঙের আগে এবং গর্ভাবস্থা চলাকালীন একাধিক ভ্যাকসিন নেওয়া যেতে পারে। ফ্লু এবং টিটেনাসের মতো পরিচিত ভ্যাকসিন তো বটেই, ডিপথেরিয়া, চিকেন পক্স, হুপিং কাশির মতো অসুখের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করতে আরও কিছু ভ্যাকসিন নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। তবে অবশ্যই নিজের চিকিৎসকের পামর্শ মেনে সেই সব ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত নির্দিষ্ট সময়ে।

চূড়ান্ত পর্যায়ে : গর্ভাবস্থা যখন প্রায় পরিণত, পরিপূর্ণ আকার ধারণ করে, সেই তৃতীয় ট্রাইমেস্টারের আল্ট্রাসাউন্ডের ব্যবধান কমে আসে। সপ্তাহ দু-তিনেক অন্তরই ডাক্তাররা চেক করে দেখেন, শিশুর গ্রোথ এবং রক্ত সঞ্চালন কী রকম ও সেই অনুযায়ী ডেলিভারির প্ল্যানিং করে থাকেন (সি-সেকশনের ক্ষেত্রে)। তাই এই সময়ের ডপলার আল্ট্রাসাউন্ডগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ। সন্তান আসার খবর পাওয়া মাত্রই নানা সাবধানতা, বিধিনিষেধ ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয় মায়েদের। তবে এ সবই করা হয় ঝুঁকির সম্ভাবনা এড়াতে। নিয়ম মেনেও যথাসম্ভব স্বাভাবিক হাসিখুশি জীবনযাপন ও নিজেকে সচল রাখাও জরুরি এ সময়ে। তবেই মসৃণ হবে মাতৃত্বের যাত্রাপথ। ☐

দ্য কেরালা স্টোরি নির্জলা সত্য ঘটনা

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

গত বেশ কয়েক বছর ধরে কেরালা ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্রস্থল হয়ে গেছে। আইএসআইএস নিয়োগকারীরা সিরিয়া ও ইরাকে তাদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য তরতাজা তরুণদের ইসলামি জঙ্গি হিসেবে লাগানোর জন্য বিভিন্ন অপকৌশল ব্যবহার করছে।

‘কেরালা স্টোরি’ বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত এক চলচ্চিত্র। সুদীপ্ত সেনের নির্মিত ‘দ্য কেরালা স্টোরি’-র বহু প্রতীক্ষিত ট্রেলার ২৬ এপ্রিল ২০২৩-এ মুক্তি পায়। ছবিটি কেরলের হিন্দু ও খ্রিস্টান মেয়েদের ধর্মান্তরিত করাব সত্য ঘটনার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। কেরলে তাদের প্রথমে লাভ জিহাদের ফাঁদে ফেলে এবং পরে পাচার করে ইরাক ও সিরিয়ায় আইএসআইএস সন্ত্রাসবাদী হতে বাধ্য করেছে। ছবিটা হিন্দি, তামিল, তেলুগু ও মালায়লাম ভাষায় ৫ মে ২০২৩-এ মুক্তি পায়।

মুক্তির আগেই ছবিটি সামাজিক মিডিয়া এবং মূলধারার মিডিয়াতে উদারপন্থী ও ইসলামি জেহাদিদের তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়ে। বেশিরভাগই রে রে করে ওঠে। চলচ্চিত্রের মূল গল্পকেই তারা অস্বীকার করছে। প্রথমে অভিযোগ করা হলো যে কেরালা থেকে কেউ আইএসআইএস-এ যোগ দেয়নি। যখন প্রাসঙ্গিক বিষয় এবং প্রতিবেদনগুলো উদ্ধৃত করা হলো তখন তার সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। ছবির নির্মাতারা দাবি করেছেন যে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত মেয়ের সংখ্যা ৩২০০০-এর বেশি। অন্যদিকে প্রগতিপন্থীরা অন্য বিষয় উদ্ধৃত করে দাবি করেছে যে সংখ্যাটা কয়েকশোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেন সংখ্যা কম হলেই নিরীহ মেয়েদের সন্ত্রাসবাদী বানানোর অপরাধকে লঘু করে দেওয়া যায়!

সবাই জানেন যে ধর্মান্তরণ ও লাভ জেহাদ কেরালায় গুরুতর আকার ধারণ করেছে, যেমনটা এই ছবিতে দেখানো হয়েছে। শীর্ষ আদালতে আবেদন করা হয়েছিল যে ছবিটি সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়কে খারাপ ভাবে দেখানো হয়েছে। পরিচালক দাবি করেছেন যে ছবিতে দেখানো হয়েছে কীভাবে আন্তর্জাতিক ইসলামি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে লালনপালনের জন্য ধর্মের অপব্যবহার

ফতিমা ইশা

সোনিয়া সিবাসটিয়ান

মেরিন জেকব পাল্লাথ

রেফেয়ালা

করা হয়।

কেরালায় জোরপূর্বক ধর্মান্তরণ ও আইএসআইএসে নিয়োগের সমস্যা কতটা গভীর তা দেখা দরকার। 'লাভ জেহাদ'-এর অস্তিত্ব কোনোমতেই অস্বীকার করা যাবে না। আদালত অস্বীকার করলেও নয়। পাবলিক ডোমেইনে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে শুধুমাত্র হিন্দু মেয়েরাই নয়, খ্রিস্টান মেয়েদেরও মোল্লা-মৌলবি নির্দেশে মুসলমান যুবকরা প্রলুব্ধ করে। তারা মিথ্যা প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে এই মেয়েদের বিয়ে করে তাদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করে। তারপর ইরাক ও সিরিয়ার মতো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে পাঠায়। সেখানে তাদের সন্ত্রাসবাদী বা যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া দাবিকৃত নির্যাতিতার সংখ্যার সপক্ষে প্রমাণও আছে।

নির্যাতিতাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়েছে। কেরালায় জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তর এবং লাভ জেহাদের বাস্তব চ্যালেঞ্জের যথার্থতা প্রমাণ করার পর্যাপ্ত তথ্য আছে— ভয়ংকর সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আইসিএসের নিয়োগের জন্য কেরালা উর্বর ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

অনেক আগে থেকেই কেরালা-আইএসআইএস-এর নিয়োগের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। কেরালায় আইএসআইএস-এর যোগসাজশ প্রাথমিকভাবে ২০১৩ সালে শনাক্ত করা হয়েছিল। ২০১৪ সালের প্রথম দিকে আইসিস কেরালায় শিকড় গাড়ে। মডিউলগুলো ধর্মান্তররণে উৎসাহিত করে এবং আফগানিস্তান ও সিরিয়ায় তাদের সৈন্যদলে যৌনদাসী হিসেবে প্রেরণ করে। সাম্প্রতিককালে কেরালার প্রচুর পুরুষ ও মহিলা আইএসকেপি (ইসলামিক স্টেট অব খোরাসান প্রদেশ)-তে যোগদান করেছে বলে জানা গেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘও '২০২০ সন্ত্রাসবাদ' প্রতিবেদনে সতর্ক করেছে যে ভারতের কেরালা রাজ্যে যথেষ্ট আইএসআইএস সন্ত্রাসবাদী রয়েছে।

নিষিদ্ধ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া (পিএফআই) কেরালাকে আইএসআইএস নিয়োগের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করার জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করছে। মুসলমান যুবকদের জেহাদিতে পরিণত করা এবং অমুসলমানদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করার কাজ পিএফআই সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে কোচির একটি আদালতে জাতীয় তদন্ত সংস্থার দায়ের করা একটি প্রতিবেদনেও এটা বলা হয়েছিল।

আফগানিস্তানের জেলে বন্দি ছিল কেরালার চার মেয়ে। সেই অনুযায়ী ২০০৮-২০০৯ সালে কেরালায় অনেক মেয়ে ধর্মান্তরিত হয়েছে। ধর্মান্তরিত মেয়েদের এবং তাদের মুসলমান স্বামীদের আইসিস-এ পাঠানো হয়েছিল। ২০১৬ সালে কেরালার মেয়েদের এই ভয়ংকর কাহিনি প্রকাশ্যে আসে। তাদের প্রথমে আফগানিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। লাভ জিহাদের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর খবর হলো চারটে মেয়েকে ২১ জনের দলে নিয়ে গিয়ে তাদের স্বামীদের সঙ্গে ২০১৬ সালে আইসিস-এ যোগ দিতে বাধ্য করেছিল জেহাদিরা।

ওই চার কিশোরীর নাম সোনিয়া সেবাস্তিয়ান ওরফে আয়েশা, মেরিন জ্যাকব ওরফে মারিয়াম, নিমিশা ওরফে ফাতিমা ইসা এবং রাফায়েলা। এই চার মেয়ের মধ্যে নিমিশাই ছিল একমাত্র হিন্দু মেয়ে। বাকি তিনজন ছিল খ্রিস্টান। এই চার মেয়েকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে মুসলমান হওয়ার প্রলোভন দেওয়া হয়। তারা ২০১৬ সালে কেরালার ২১ জন পুরুষ ও মহিলার একটি দল আফগানিস্তানে আইএসকেপি (খোরাসান প্রদেশের ইসলামিক স্টেট)- আইইসএস-এর খোরাসান সংস্করণে যোগ দিতে ভারত ছেড়েছিল। তাদের প্রথমে ইরানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তারপর ইরান থেকে পায়ে হেঁটে আফগানিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়।

সোনিয়া সেবাস্তিয়ান ওরফে আয়েশা কেরালার কাসারগোডের বাসিন্দা। ২০১৬ সালের ৩১ মে সে তার স্বামী আব্দুল রশিদ আবদুল্লার সঙ্গে মুম্বাই বিমানবন্দর থেকে ভারত ছাড়ে। এই দম্পতি রমজানের শেষে পাদান্না ও কাসারগোড়ে আইএস ও জিহাদকে সমর্থন করার জন্য গোপন ক্লাস করেছিল। সেবাস্তিয়ান একজন ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতক।

মেরিন জ্যাকব ওরফে মারিয়াম পালাক্কাডের বাসিন্দা বেস্টিন ভিনসেন্টকে বিয়ে করেছিল। এই দম্পতি ২০১৬ সালে আফগানিস্তানে পালিয়ে আইএস-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে বসবাস করে। এই খ্রিস্টান দম্পতি ইসলাম গ্রহণ করে এবং ভিনসেন্ট ইয়াহিয়া নাম গ্রহণ করে। পরে আফগানিস্তানে নিহত হয় ভিনসেন্ট।

একইভাবে ভিনসেন্টের ভাই বেক্সন এবং তার স্ত্রী নিমিশা ওরফে ফাতিমাও ইসলাম গ্রহণ

করে এবং তাদের সঙ্গে আফগানিস্তানে পালিয়ে যায়। রাফায়েলা কাসারগোডের একজন চিকিৎসক ৩৭ বছর বয়সি চিকিৎসক ইজাস কাল্লুকেত্তিয়া পুরাইলকে বিয়ে করেছিল।

মেরিন জ্যাকব পাল্লাথের নাম হয় মারিয়াম। ২২ বছর বয়সে মেরিন জ্যাকব পালাথ মুম্বাইয়ের আইবিএম কোম্পানিতে কাজ করত। মুম্বাইতে থাকার সময়ে সে তার হাইস্কুলের বন্ধু বেস্টিন ভিনসেন্টের সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করে। এই বেস্টিন ভিনসেন্ট ইসলাম গ্রহণ করে ইয়াহিয়া হয়েছিল। বেস্টিন ভিনসেন্টের ভাই বেক্সিন ভিনসেন্টও ইসলাম গ্রহণ করে এসা হয়। মুম্বাইয়ের ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের ম্যানেজার আরশি কুরেশি এই দুই যুবককে কট্টরপন্থী বানিয়েছে বলে অভিযোগ। ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি এই ধরনের বিবরণ-সহ এই মামলা নথিভুক্ত করেছে।

ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন সংগঠনটি জাকির নায়েক প্রতিষ্ঠিত করেছিল। জাকির একজন পলাতক বিতর্কিত কট্টর ইসলামি প্রচারক। সে এখন মালয়েশিয়ায় থাকে। এবং তরুণদের জেহাদি করণের কারণে উদ্বিগ্ন হয়ে সরকার ২০১৬ সালে সংগঠনকে নিষিদ্ধ করে। এক প্রতিবেদন অনুসারে মেরিন জ্যাকবের মা বলেছেন, 'আমার মেনে এবং অন্য যারা আফগানিস্তানে গিয়েছিল তাদের দলে যোগ দেওয়ার জন্য মগজধোলাই করা হয়েছিল। মুসলমান হলে জান্নাতের পথ নিশ্চিত এই লোভ দেখিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করা হয়েছিল। বেস্টিন বোম্বেতে তার সঙ্গে দেখা করে এবং তাকে একটা কোরান দেয়। সে তার মাকে বলেছিল যে মায়ের এটা পড়া উচিত এবং মেরিন বলে তাকে যা শেখানো হয়েছে তা তার মাকেও শিখতে হবে এবং ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু তার আগে মেরিন সবসময়ই খুব স্নেহার্দ্র ও ধর্মপরায়ণ ছিল। আমরা একসঙ্গে চার্চে যেতাম। আমরা একসঙ্গে সবকিছু করেছি।'।

মেরিন জ্যাকেবের বন্ধু নিমিশা হয়েছে ফাতিমা। ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করার কয়েক মাস পর মরিয়ম তার চাকরি থেকে ইস্তফা দেয়, এর্নাকুলামে স্থানান্তরিত হয়, ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইয়াহিয়াকে বিয়ে করে। এক সময়ে তার বন্ধু নিমিশা ইসলাম গ্রহণ করে। তার নাম পরিবর্তন করে ফাতিমা রাখা হয় এবং এসাকে বিয়ে করে। তার মেয়ের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের কথা স্মরণ করে নিমিশার মা বিন্দু সম্পথ বলেন, ২০১৬ সালের 'নিমিশা ১৬ এপ্রিল, আমাদের বাড়িতে এসেছিল। আমাদের বলেছিল যে তারা বেক্সিনের বাবার দেওয়া অর্থ দিয়ে একটি কার্পেট ব্যবসা করতে শ্রীলঙ্কায় যাচ্ছে। সে বোরখা পরে ছিল এবং সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল। দুই সপ্তাহ পর যখন নিমিশা তার মাকে চিঠি পাঠানো বন্ধ করে দেয় তখন তার সন্দেহ হয় যে কিছু একটা ভয়ংকর অন্যায় ঘটেছে। তিনি বলেন, '৮ মে, আমি পুলিশের কাছে রিপোর্ট করার চেষ্টা করি যে আমার মেয়ে বিপদগ্রস্ত। কিন্তু তারা আমার আশঙ্কার কথা উড়িয়ে দেয়'।

নিমিশার মা যখন দেখতে যান ইয়াহিয়া এবং এসার বাবা-মা তাকে জানিয়েছিলেন যে

কেরালা স্টোরি নিয়ে খুব সমালোচনা হচ্ছে চারদিকে। এই সিনেমার বিষয়বস্তু সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্র নিয়ে। কীভাবে ছদ্মবেশে জঙ্গিরা সমাজের ভিত নাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, এই সিনেমায় সেটাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

সিনেমাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে অবিচার করা হলো। তোষণ ও ভোটব্যাংক রাজনীতির জন্য এমনটা করা হলো।... আমি এদের পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করতে চাই তারা কি আইসিস জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে আছেন?

অনুরাগ ঠাকুর
কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রী

সেন্সর বোর্ড যখন ছবিটিকে ছাড়পত্র দিয়েছে, তখন রাজ্য ছবি প্রদর্শনে বাধা দিচ্ছে কেন?

শুভাপ্রসন্ন
বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী

সিনেমাকে ব্যান করেন অসভ্য লোকেরা।...আমি মনে করি, শিল্প-সাহিত্য ঘৃণা ছড়ায় না, কোথাও আগুন ধরায় না।

তসলিমা নাসরিন
লেখিকা

তাদের সন্তানরা আফগানিস্তানে রয়েছে। তারা তাদের সন্তানদের কাছ থেকে টেক্সট মেসেজ পাচ্ছিল। একই সন্ধ্যায় একটি আইএসআইএস সন্ত্রাসবাদী গ্যাঙের ২১ জন সদস্যের মধ্যে তাদের সন্তানদের মুখ দেখে অভিভাবকরা হতবাক হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, নিমিশার ভাই ভারতীয় সেনা ; বাহিনীতে কর্মরত ছিল। তার মা বিন্দু সম্পথ বলেন, 'আমি সেদিন জানতাম আমাকে আবেগ দূরে রেখে আমার মেয়েকে ফিরিয়ে আনার লড়াই শুরু করতে হবে। আমার অন্য সন্তান সেনাবাহিনীতে এবং আমি একজন ভারতীয় মেজরের মা হিসেবে পরিচিত ছিলাম। এখন আমি একজন 'আইএসআইএস সন্ত্রাসবাদীর মা' হিসেবে পরিচিত। কল্পনা করতে পারেন আমার কেমন অনুভূতি হয়!'

সোনিয়া সেবাস্তিয়ান মুসলমান হয়ে আয়েশা হয়। আবদুল রশিদ সোনিয়া সেবাস্টিয়ানকে মিথ্যা প্রেমের জালে প্রলুব্ধ করে তাকে আয়েশাতে পরিণত করে। ২০১৬ সালের মে মাসে কেরালা ছেড়ে আইএসআইএস-এ যোগদানকারী ২১ জনের প্রথম দলের মধ্যে এই জুটিও ছিল। এনআইএ তদন্ত অনুসারে আবদুল রশিদ কেরালা গ্রুপের সদস্যদের র‍্যাডিক্যালাইজেশন এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। আব্দুল রশিদ কাসারগোড়ে আইএসআইএস প্রার্থীদের পড়াতেন। তিনি জিহাদ এবং আইএসআইএস-এর ধারণা সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেন। এই সদস্যদের আইএসআইএস মতাদর্শ এবং বর্বরতা সংবলিত ভিডিয়োয় দেখানো হতো। রশিদ সিরিয়ায় আইএসআইএস যোদ্ধাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য ডার্ক ওয়েব ব্যবহার করে সেখানে যোগ দিয়েছিল।

মরিয়ম এই আব্দুল রশিদকে বিয়ে করেছিলেন যে রশিদ আগে সোনিয়া সেবাস্তিয়ান ওরফে আয়েশাকে বিয়ে করেছিল, বেস্টিন ভিনসেন্ট ওরফে ইয়াহিয়া আইএসআইএস সন্ত্রাসবাদী নিয়োগে নিহত হওয়ার পরে। যখন আব্দুল রশিদকে হত্যা করা হয় তখন দলের সকল নারী, শিশু ও পুরুষ আত্মসমর্পণ করে এবং ২০১৯ সালে আফগান কর্তৃপক্ষ তাদের গ্রেপ্তার করে। এটা সত্যি যে, সোনিয়া সেবাস্তিয়াম ২০১১ সালে আব্দুল রশিদকে বিয়ে করে মুসলমান হয়েছিল। এটা খুব জোরের সঙ্গে বলা যায় যে আগে থেকেই কেরালা ধর্মান্তরণ র‍্যাকেট খুব সক্রিয় ছিল।

ধর্মান্তরিত হওয়ার পর এই মুসলমানদের পাঠ্য, অডিয়ো এবং ভিডিয়ো মাধ্যমে জিহাদি বিষয়বস্তু গেলানো হতো। এছাড়া স্থানীয় মোল্লা-মৌলবিরা তাদের কাছে বিভিন্ন ধারণা স্পষ্ট করার দায়িত্ব নিত। তাদের বলা হতো যে ভারত কাফেরদের দেশ এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত আইসিএসের অংশ হওয়া প্রতিটা মুসলমানের কর্তব্য। তাদের সমস্ত বিজ্ঞাপন দিয়ে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হতো যে যদি তারা কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে মারা যায় তাহলে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে। তাদের আরও বলা হয়েছিল যে খোরাসানে ইসলামি শাসন রয়েছে--- খোরাসান মানে ইরান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের অংশগুলো একত্রিত করলে যা হয়। তাদের বলা হয়েছিল যে সেখানে শরিয়ার নিয়ম চালু রয়েছে এবং তারা কাফিরদের দেশে না থেকে খোরাসানে থাকলে ভালো জীবনযাপন করতে পারবে।

বিভ্রান্তি চলতেই থাকে। এমনকী ২০১৯ সালে তাদের গ্রেপ্তারের পরেও এই মহিলারা যখন জেহাদি মতাদর্শ এবং আইসিস সম্পর্কে তাদের মোহগ্রস্ত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করত তখন বোঝা যেত তারা বিভ্রান্ত। খিলাফত ও শরিয়া শাসনের নামে যে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল তার জন্য তারা শুধু অনুশোচনা ও দুঃখ প্রকাশ করেছিল। তারা বলেছিল যে তাদের ধারণা ছিল যে কিছু সহিংসতা হবে, কিন্তু তা এত প্রাণঘাতী হবে তা কখনই আশা করেনি। এমনকী তাদের স্বামী এবং সঙ্গীকে হারানোর পরেও— কেউ মারা গেছে এবং কেউ নিখোঁজ হয়েছে— কোনও মহিলাকে বলতে শোনা যায়নি যে তারা তাদের ধর্ম ত্যাগ করতে এবং ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে ভুল করেছিল যা থেকে পরে সন্ত্রাসবাদী, দেশ ও মানবতার শত্রু হওয়ার আরও গুরুতর ভুল করতে হয়েছিল। তাদের সাক্ষ্যের বিস্তারিত বিবরণ ২০১৯ সালে স্টার নিউজ গ্লোবালের তৈরি এক ডকুমেন্টারিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

যদিও মারিয়াম আফগানিস্তানে আসার সিদ্ধান্তের জন্য সম্পূর্ণ অনুশোচনা করেছিল কিন্তু সে ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য অনুশোচনা করেনি। ফাতিমা যে ধর্মান্তরিত হওয়ার আগে নিমিশা ছিল তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সে এটাকে আল্লার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়ে বলেছে যে সে তার ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন করতে পারবে না। সোনিয়া সেবাস্টিয়ানও পরোক্ষভাবে তার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছে এই বলে যে সে কেবল তার স্বামীকে অনুসরণ করেছে যাকে সে তার সর্বোত্তম স্বার্থে বলে মনে করে। সোনিয়া সেবাস্টিয়ান একজন প্রযুক্তিবিদ। যখন তার নির্বোধ সিদ্ধান্ত এবং সে অন্যদের কী পরামর্শ দেবে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সে যা বলেছিল তা ঠিক ছিল না। সে যে ভয়ংকর দুরবস্থার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল তার পুরো পরিকল্পনার নিন্দা করেনি। একইভাবে রাফায়েলাও ইসলামি সন্ত্রাসের দ্বারা বশীভূত ছিল, কারণ সে জেহাদিদের দ্বারা সংঘটিত অন্যায়কে সোচ্চারভাবে নিন্দা করেনি। এমনকী আইএসআইএস-এর খোরাসান ইউনিটের গৃহীত কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করার সময়েও এই মহিলারা এটাকে ভুল বলা থেকে বিরত ছিলেন। তাদের সবার মধ্যে একটা বিষয় কমন ছিল। তারা ভারতে আসতে চেয়েছিল। তারা বলেছিল যে তারা এই ভারতেরই— যে দেশকে তারা আগে কাফেরদের দেশ বলেছিল।

এনআইএ-এর তদন্ত অনুসারে এই ব্রেনওয়াশ করা আইএসআইএস সন্ত্রাসবাদীদের কখনই সমাজে রাখা নিরাপদ নয়, কারণ তারা গোপনে তাদের মতাদর্শ চালিয়ে যেতে পারে। এই আশঙ্কা মাথায় রেখে ভারত সরকার আইএসআইএস অপারেটর এবং তাদের পিতা-মাতা ও পরিবারের সদস্যদের বার বার আবেদন ও অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও তাদের দেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সমস্ত বাস্তব দিক থেকে বলা যায় কেরালার এই মহিলারা তাদের পরিবর্তিত— বলা ভালো পরিকল্পনা করে করা— অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসরণ করে যা পেয়েছে তা ইসলামিক স্টেটের এক করুণ বিভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। দ্য কেরালা স্টোরি চলচ্চিত্রটি কেরালার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশের মানুষ বিশেষ করে মেয়েরা জেহাদি কর্মকাণ্ডের বিষয়ে অবগত হবে এবং সাবধানতা অবলম্বন করবে। পরিচালক সুদীপ্ত সেন কঠিন সময়ে কঠিন কাজটি সম্পন্ন করেছেন। ■

দুষিত মানসিকতা দ্য কেরালা স্টোরিকে নিষিদ্ধ করেছে

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ৫ মে 'দি কেরালা স্টোরি' ছবিটি মুক্তি পেয়েছে সমগ্র ভারতব্যাপী বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী মহলের খবর অনুযায়ী ছবিটি মানুষের হাত খোলা দাক্ষিণ্য পাচ্ছে। বহু দিনের অদেখা কোনো বস্তু সে অর্থে সত্যকে প্রত্যক্ষ করার এমন অভিজ্ঞতা তাদের ভালো লেগেছে। ৭ দিন পেরোতে না পেরোতেই কেরালা ও সেই সংক্রান্ত এক ভয়াবহ বাস্তব চিত্রিত ছবিটি ইতিমধ্যে আমাদের এই সুযোগসন্ধানী সেকুলার রাজ্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গই প্রথম কোপ মারল সুদীপ্ত সেন নামের এক বাঙ্গালি পরিচালকের ওপর। যিনি সবিনয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন যে তিনি যেন ছবিটি দেখে বলেন এতে কোন নির্দিষ্ট ধর্মবাদীদের আলাদা প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। কে শোনে কার কথা, হাওড়ার বেলুড়ে ছবির অনলাইন টিকিট কাটা দর্শকরা হল বন্ধ দেখে হই হই করলে পুলিশ লাঠি চার্জ করেছে।

ইতিমধ্যে আমরা আইএসআইএস নামের খিলাফতি শাসন প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর জঙ্গি বাহিনীর রক্তক্ষয়ী কার্যকলাপ বিশেষ করে তরুণী মেয়েদের অপহরণ, ধর্মান্তর ও পাচার— এই তিন পিলারের ওপর কাজ করার কথা শুনেছি। এখন এই ধর্মান্তরকে ছুঁতো করেই এখানে ছবিটি বাতিল হয়েছে। এনএসজি এবং আরএডব্লুউ-এর পূর্বতন এক অধিকর্তা দেবাঞ্জন চক্রবর্তী কেরালা স্টোরির কেন্দ্রীয় চরিত্র আইএসআইএস-এর জঙ্গিদের সম্পর্কে বলেছেন, এরা কোরানের বাইরে গিয়ে 'খোরাসান' অনুযায়ী সর্বাগ্রে বিশ্বের পূর্ব দিকের ভারত ও তারও পূর্ব দিকের পশ্চিমবঙ্গকে টার্গেট করে মেয়ে পাচার, লাভ জিহাদ ও ইরাকে রপ্তানি করার এক জরুরি ভিত্তিক পরিকল্পনা করেছে। তথ্যে প্রকাশ, ২০১৬-২০-র মধ্যে কেরালা থেকে ১৪৩১০২ ও তামিলনাড়ু থেকে ৫৩৭৮০ জন তরুণী নিখোঁজ হয়েছে। এই ছবিটিতে এই হতভাগ্য মেয়েদের জঙ্গি জালে জড়ানো, সম্পূর্ণভাবে আকৃষ্ট হয়ে যাওয়া, খুব দ্রুততায় ইরাক বা সিরিয়ায় রপ্তানি হওয়ার পর আজীবন এক ভয়াবহ যৌনদাসীবৃত্তির পেশা অবলম্বনে বাধ্য হওয়া— চলচ্চিত্রে সেই বাস্তবচিত্রের ওপরই আলোকপাত করা হয়েছে।

এর মধ্যে সত্যি ঘটনা ভিত্তিক চিত্রবিন্যাসও আছে। কেরালা থেকে অপহৃত গীতাঞ্জলি (পূর্বনাম) যখন বুঝল যে বাবা-মার কথা গ্রাহ্য না করে ধর্ম পরিবর্তন তার জীবনে যে এক ভয়ংকর বিপর্যয় ডেকে এনেছে, তারপর কোনো ক্রমে বাড়িতে ফিরতে পেরে বাবার কোলে মাথা রেখে হাউ হাউ করে কেঁদে সে উপলব্ধি ব্যক্ত করেছে— 'বাবা তোমরা ছোটোবেলা থেকে কেন বাইরের রীতিনীতি, কমিউনিজমের ইডিওলজি রপ্ত করালে? তোমরা কোনো দিন আমাদের দেশের নিজস্ব রীতিনীতি, ধর্মাচরণ কোনো কিছুই পরিষ্কার করোনি। আমরা ঠিক ভুলের বিচারে নিজেদের জীবন নষ্ট করে ফেললাম।'

এখানে রাজনীতির সঙ্গে একত্রীকরণ করার কোনো বিষয় নেই। নিজের সংস্কৃতি বিসর্জন দেওয়ার আগে এগুলি যে বিচার্য প্রসঙ্গই এটাই ছবির মেরুদণ্ড। যে তিনটি মেয়েকে চিত্রনাট্যের প্রেক্ষাপটে রাখা হয়েছে তাদের মধ্যে শালিনীরও একই করুণ পরিণতি হয়েছে।

এমন দৃশ্য আছে যেখানে মেয়েটি বলছে রাস্তায় বেরোলে ছেলেরা বিশ্রীভাবে উত্ত্যক্ত করে। জাল ফেলা দামাল মেয়ে বোঝাচ্ছে, দেখ মুসলমান হয়ে গেলে এই ঝামেলা থাকবে না। আল্লাই একমাত্র রক্ষক। ধর্মান্তর করলে আল্লা তোমাকে রক্ষা করবে। তার বান্দাকে কেউ খারাপ করার সাহস পাবে না। মেয়েটি চোখের জলে বলছে আর কোনো ঈশ্বর করবে না? অথচ রবীন্দ্রনাথের বলা 'আমি হিন্দু এ কথা বলিলে যদি নিতান্তই কোনো লজ্জার কারণ যাকে, তাতে সে লজ্জা আমাকে নিঃশব্দে হজম করিতেই হইবে কারণ আমি মনে প্রাণে একজন হিন্দু'।

মনে হয় এসব কথা আমাদের রাজ্যে এখন তাঁমাদি হয়ে গেছে। নইলে লক্ষণীয় কোনো দল, গোষ্ঠী বা নির্দিষ্ট ধর্ম মতের লোক কেউ এই ছবি নিষিদ্ধকরণ দাবি করেনি। শুধু ভোট যাতে রাজভোগ হয়ে বাড়ে তাই এই সাংস্কৃতিক আক্রমণ। এই সূত্রে গত কয়েক বছর ধরে তালিবানি বা আইএসআইএস জঙ্গিরা কীভাবে ভারতীয় মেয়েদের নানা ছলে জড়িয়ে ধর্মান্তরিত করছে তার সত্যনিষ্ঠ দৃশ্যাবলী রয়েছে। ছবিতে শালিনী পরে (ফতিমাকে) ধর্মান্তরিত করে স্বামীর সঙ্গে সিরিয়া পাঠানো হয় যাতে তারা মুসলমান দেশের জন্য লড়াই করে। ছবিতে আফগানিস্থানে ধরা পড়ে জেলযাত্রা। তার দুই স্কুল-বন্ধু গীতাঞ্জলি আর নিসাকেও আকৃষ্ট করা হয় এই ধর্মান্তরণ যাত্রায়। তাদের এই সর্বনাশের পরিচালক ছিল অপর এক বান্ধবী আসিফা।

উপসংহারে বলা যায় তিনটি নার্সিং ছাত্রীকে চক্রান্ত করে তাদের আইএসআই-এর কাজে লাগানো ও নৃশংস অত্যাচার যার কথা আমরা টিভি বা সোশ্যাল মিডিয়ায় বিক্ষিপ্ত দেখেছি। সেই নারীপাচার ও তাদের জীবন বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার জ্বলন্ত সমস্যাকেই ছবির পর্দায় তুলে এনে কোটি কোটি মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছেন সুদীপ্ত সেন। লাভ জিহাদ, ছলনায় ধর্মান্তরণ সম্পর্কে মানুষ যাতে সচেতন হয়। ছবিটির কারিগরি কাজ উচ্চমানের। এই সূত্রে হতভাগ্য ধর্মান্তরিত মেয়েগুলির জীবনে ঘটা নির্মম কাহিনি তিনি চলচ্চিত্রীয় কুশলতায় ক্যামেরাবন্দি করেছেন। একজন চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে সৎভাবে মানুষকে সাবধান হওয়ার কথা, নিজ সংস্কৃতিতে স্থিতবান থাকার আকুল আহ্বান তাঁর নিজের মাধ্যমে তিনি দিয়েছেন। আকণ্ঠ নিজ স্বার্থে নিমগ্ন কিছু দুষিত মানসিকতা তাকে পরিহার করল। এটা জাতীয় ক্ষতি। ■

মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ তিনি নিজে যেন ছবিটি দেখেন। ছবিটি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

সুদীপ্ত সেন
পরিচালক, দি কেরালা স্টোরি

ফঃ ৪

পরিপূর্ণ দর্শকাসন। তিরুবনন্তপুরমে একটি প্রেক্ষাগৃহে দি কেরালা স্টোরি দেখছেন দর্শকরা।

‘দ্য কেরালা স্টোরিকে’ নিষিদ্ধ করে মুখ্যমন্ত্রী ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীদেরই প্রেরণা জোগালেন

মন্দার গোস্বামী

রানিরোষে নিষিদ্ধ হয়ে গেল ‘দ্য কেরালা স্টোরি’। এই রাজ্যের আর কোনো সিনেমা হলে এই ছবি দেখা যাবে না। ‘দুধেল গাই’দের অবাধ বিচরণভূমি এই পশ্চিমবঙ্গে এমন ঘটনা অপ্রত্যাশিত তো নয়ই বরং অতি প্রত্যাশিতই বটে। যিনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে বলে স্লোগান দেন, যে রাজ্যের আনাচে কানাচে শাসকদল মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের মুক্তাঞ্চল, সে রাজ্যে সিনেমাটির যা ভবিতব্য ছিল তাই ঘটল। এরপর কোর্টের আদেশ পেলেও শাসক বিরোধিতার ঝুঁকি কোনো হল মালিক নিতে চাইবেন বলে মনে হয় না। মোমবাতি বাহিনী, বাক্‌স্বাধীনতার পক্ষে গলা ফাটানো আন্দোলনকারীরা যথারীতি চুপ।

২০১০ সালে কমিউনিস্ট নেতা ভি এস অচ্যুতানন্দন দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে খোলাখুলি বলেছিলেন যে, কেরালায় মুসলমান কট্টরবদীরা অর্থ, প্রলোভন অথবা বলপূর্বক ধর্মান্তরের পাশাপাশি হিন্দু মহিলাদের ছলে বলে কৌশলে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে বিয়ে করে রাজ্যে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনা নিয়েছে, যাতে আগামী কুড়ি বছরে কেরালা একটি মুসলমান অধ্যুষিত রাজ্যে পরিণত হয়। একজন কমিউনিস্ট হয়েও তিনি লাভ জিহাদের ভয়াবহ দিক সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেছিলেন। ভি.এস যে সে লোক নন, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কারণে সারা রাজ্যের গোপন গেয়েন্দা রিপোর্ট তাঁর টেবিলেই আসত। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং অন্যান্য তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই তিনি এমনটি বলেছিলেন। আজকের কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন স্বয়ং ভি এস-কে সমর্থন করে কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত ইউডিএফ-এর সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের আঁতাতের অভিযোগ করেছিলেন। আজ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে বিজয়ন উলটো গাইছেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বেশ কিছু জেহাদি সংগঠন কেরালায় অমুসলমান মেয়েদের ধর্মান্তরিত করে বিয়ের পর উপসাগরীয় দেশগুলোতে পাচার করে।

পাচার হওয়া মহিলাদের পরবর্তীকালে বিভিন্ন মডিউলের মাধ্যমে আইএসআইএস-এর মতো সন্ত্রাসী সংগঠনে যোগদান করানো হয়। সেখানে এই মহিলারা মূলত যৌনদাসী হিসেবে কাজ করে, তাদের সন্তানদের মানববোমা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ক্রমাগত ধর্ষণ, অতি অস্বাস্থ্যকর নারকীয় জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে একসময় এরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। অতি সামান্যই পালাতে পারে। বাকিদের পরিণতি মৃত্যু। ‘দ্য কেরালা স্টোরি’ মূলত তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম শালিনী উন্নিকৃষ্ণন। এই হিন্দু তরুণী জিহাদি পরিকল্পনানুযায়ী ধর্ম পরিবর্তন করে ফতিমা হয়েছেন। একজন আফগানিস্তানে জেলে বন্দি এবং একজন আত্মহত্যা করেছে। মূলত এদের সম্মিলিত কাহিনির মাধ্যমেই পরিচালক সুদীপ্ত সেন কেরালার ৩২ হাজার অভাগা মহিলার দুর্দশা বর্ণনা করেছেন। এর জন্যে শ্রী সেন-কে বহু ভুক্তভোগী পরিবারের সাক্ষাৎকার নিতে হয়েছে। অসংখ্য সরকারি রিপোর্ট অধ্যয়ন করতে হয়েছে। বলতে গেলে সত্য ঘটনার উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে এই ছবি। এর পরেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ

অংশ কাটছাট করে এই ছবি মুক্তি পেয়েছে। তাতেই ভিমরুলের চাকে ঢিল পড়েছে। রে রে করে তেড়ে উঠেছে তোষণকারী রাজনৈতিক দলগুলি। তাতে কি সত্যকে অস্বীকার করা চলে?

ইন্ডিয়া টুডের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের পরে গঠিত এনডিএফ থেকে একসময় বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী সংগঠন পিএফআই-এর সৃষ্টি হয়েছিল। পিএফআই প্রায় ২০টি পৃথক উইং গঠন করেছে— মহিলা, শিশু, ছাত্র, ইমাম, আইনজীবী, ডাক্তার, সাংবাদিক ইত্যাদির জন্য। এমনকী ধর্মান্তরিতদের জন্যও আছে বেশ কয়েকটি ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র। কোঝিকোড়ে থারবিয়াতুল ইসলাম সভা, মারকাজুল হিদায়া বা সত্য সরণি ট্রাস্টের মতো সংগঠনগুলি প্রকাশ্যে অল্পবয়সি অমুসলমান মেয়েদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করছে। পিএফআই নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে শুধুমাত্র তাদের প্রকাশ্য কর্মকাণ্ডগুলি বন্ধ হয়েছে। কিন্তু তাদের স্লিপার সেলগুলি এখনও বেনামে আন্ডারগ্রাউন্ডে কাজ করছে। সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অব ইন্ডিয়া, জামায়াত-ই-ইসলামি হিন্দ (জেআইএইচ) এবং পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি (বিডিপি)-এর মতো অনেক বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন বহাল তবিয়তে কাজ করছে।

২০১৬ সালে টাইমস অব ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুসারে, কেরালায় ছ' হাজারেরও বেশি পুরুষ ও মহিলা ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে। সাত মাস আগে রাজ্য পুলিশ প্রধানের কাছে জমা দেওয়া একটি গোয়েন্দা প্রতিবেদন অনুসারে এবং টাইমস অব ইন্ডিয়া-র তথ্য অনুযায়ী, কোঝিকোড় ও মালাপ্পুরমের দুটি 'স্বীকৃত' ধর্মান্তর কেন্দ্র ২০১১ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ৫৭৯৩ জনকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেছে।'

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের প্রায় অর্ধেকই নারী এবং এই নারীদের অধিকাংশই (৭৬ শতাংশ) ৩৫ বছরের নীচে। ধর্মান্তরিতদের মধ্যে ৪৯১৯ জন হিন্দু এবং বাকি ১০৪৭ জন খ্রিস্টান। ইন্ডিয়া টুডে-এর ২০১৭ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, পিএফআই কীভাবে নিরপরাধ হিন্দুদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করেছিল এবং কীভাবে তারা ধর্মান্তরিতদের অর্থ প্রদান করেছিল, তার বর্ণনা রয়েছে।

শুধু তাই নয়, ২০১১ সালে কেরালায় ওমেন চণ্ডির নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার গঠন করে। পরের বছর ২৫ জুন, কেরালা বিধানসভায় একটি চমকপ্রদ রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল। এতে বলা হয়, ২০০৫ সাল থেকে প্রতি বছর গড়ে ২,৮০০ থেকে ৩,২০০ মেয়েকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে। গত ১০ বছরে ধর্মান্তরিত মেয়েদের সংখ্যা বিস্ময়করভাবে ৩০ হাজার বা তারও বেশি হতে পারে। ধর্মান্তরিত হওয়ার পরে, তাদের বেশিরভাগই খুঁজে পাওয়া যায় না। তালেবান, আইএসআইএস এবং আল-কায়েদা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তান এবং মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ অঞ্চলে তাদের পাঠানো হয়।

পরিচালক শ্রী সেনকে ধন্যবাদ যে তিনি ঝুঁকিপূর্ণ হবে জেনেও এই জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে ছবি বানিয়েছেন। সমগ্র ভারতবর্ষের কয়েকটি রাজ্য ছাড়া সর্বত্রই এই ছবি আগ্রহের সঙ্গে প্রদর্শিত হচ্ছে। সর্বত্র সমাদৃতও হয়েছে। দুর্ভাগ্য আমাদের, বাঙ্গালি পরিচালকের ছবি পশ্চিমবঙ্গেই নিষিদ্ধ করা হলো অথচ এই ছবিতে কোথাও ইসলাম বিরোধিতা নেই। ইসলামের নামে যারা নারী শোষণ করে, মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করে তাদের বিরুদ্ধে এই ছবি। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এই ছবি। অমুসলমাদের হত্যা করবার সময় আইএসআইএস কোন ধর্মীয় স্লোগান দেয়, কোন গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেয় ইন্টারনেটের দৌলতে সকলেই তা জানে। ছবি বানাতে গেলে সত্যতার খাতিরে সেগুলি দেখাতেই হয়। এই ছবি নিষিদ্ধ করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে গোটা মুসলমান সমাজকে একাসনে বসিয়ে সন্ত্রাসবাদীদেরই অনুপ্রেরণা জোগালেন।

পশ্চিমবঙ্গে দি কেরালা স্টোরি সিনেমাটি নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে রাস্তায় মানুষ।

কৃষ্ণনগরে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের প্রান্ত যোজনা বৈঠক

গত ২৯,৩০ এপ্রিল নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে সরস্বতী শিশুমন্দিরে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের প্রান্ত যোজনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ১৭টি সাংগঠনিক জেলা থেকে কার্যকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ সংগঠন সম্পাদক গজেন্দ্র সিংহ, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক শ্রীনিবাস, অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের সভাপতি কল্যাণ কুমার মণ্ডল এবং প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক অনিল চন্দ্র রায়।

২৯ তারিখে সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে বৈঠক শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন সভাপতি কল্যাণ কুমার মণ্ডল। স্বাগত বক্তেব্যে তিনি কিষাণ সঙ্ঘ কী, কেন এবং সংগঠন বৃদ্ধির বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত রাখেন। গজেন্দ্র সিংহ তাঁর বক্তব্যে বলেন, তিনি গত ১৯ এপ্রিল থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভ্রমণ করে কৃষি ও কৃষকদের সমস্যা সম্পর্কে অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। কৃষকরা সঙ্ঘবদ্ধ হলেই তারা তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য এবং সম্মান ফিরে পাবেন।

৩০ তারিখের বৈঠকে সংগঠন বৃদ্ধির বিষয়ে সকলেই মতামত প্রদান করেন। আগামী ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে 'সদস্যতা অভিযান' শুরুর কথা জানান সংগঠন সম্পাদক অনিল চন্দ্র রায়। সদস্যতা অভিযান প্রমুখ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রান্ত সহ সভাপতি আশিস সরকারকে। ৭০ হাজার সদস্য করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এরপর সংগঠনের বর্ষিক আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন পাঠ করেন প্রান্ত কোষাধ্যক্ষ পঙ্কজ বন্ধু। ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের মুখপত্র 'ভারতীয় কিষাণ বার্তা'র সম্পাদক মিলন খামারিয়া এই পত্রিকাকে কৃষকদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার আবেদন জানান। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, আগামী নভেম্বর মাসে কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের লাভজনক মূল্যের দাবিতে, যথাযথ সেচ ব্যবস্থা এবং স্বলমূল্যে বিদ্যুৎ সররবাহের দাবিতে কলকাতায় ধরনা প্রদর্শন এবং রাজ্যপাল মহোদয়কে ডেপুটেশন দেওয়া হবে। প্রান্ত যোজনা বৈঠকের আয়োজক ছিল নদীয়া জেলা সমিতি। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কার্যকর্তাদের থাকা-খাওয়া- বিশ্রাম এবং অন্যান্য বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন মৃন্ময় বিশ্বাস, দেবাশিস দাস, নির্মল বিশ্বাস, অশোক বিশ্বাস ও পরিমল বিশ্বাস।

সেবা ভারতীর উদ্যোগ রক্তদান শিবির

সেবা ভারতীর উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগের বারুইপুর জেলার জয়নগর-২ খণ্ডের মায়াহাউড়ী গ্রামের দক্ষিণ পাদুয়া নেতাজী শাখার সহযোগিতায় দক্ষিণ পাদুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সাহায্যার্থে গত ৭ মে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবির এবার চার বছরে পদার্পণ করল। ৪ জন মহিলা-সহ ৪৪ জন রক্ত দান করেন। শিবিরে উপস্থিত থেকে সবাইকে উৎসাহিত করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বারুইপুর সহজেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ অশোক শিকারী এবং দক্ষিণ পাদুয়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী মধুমিতা হালদার।

ত্রিপুরা পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

ত্রিপুরা পাওয়ার ইঞ্জিনিযার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে গত ৯ মে রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ত্রিপুরার আগরতলাস্থিত দুর্গাচৌমোহনী বিপণী বিতানে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা সরকারের বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ। উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণপদ সরকার, আগরতলা পৌর মেয়র দীপক মজুমদার, বিদ্যুৎ দপ্তরের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবাশিস সরকার, ত্রিপুরা পাওয়ার ট্রান্সমিশন লিমিটিডের জেনারেল ম্যানেজার রঞ্জন দেববর্মা, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের জেনারেল সেক্রেটারি তপন চন্দ্র দে এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেনারেল সেক্রেটারি বাবুল ঘোষ। শিবিরে ৩৩ জন রক্ত দান করেন।

পাতঞ্জল দর্শনে আত্মচৈতন্য নির্মাণপথ

অমিত ঘোষ দস্তিদার

মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর যোগদর্শনের মাধ্যমে মানবজীবনের সার্থকতার পথ প্রদর্শন করেছেন। এই যোগদর্শনপথে 'সমাধিপাদ', 'সাধনপাদ', 'বিভূতিপাদ' ও 'কৈবল্যপাদ'-এর মাধ্যমে অচ্ছেদ্য, চিরন্তন সংযোগ স্থাপিত হয় এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

সবিকল্প, নির্বিকল্প ও নির্বীজ— যোগের এই তিন প্রভেদ। যোগের লক্ষণ, স্বরূপ ও প্রাপ্তি ক্ষেত্রে পাঁচটি চিত্তবৃত্তি— প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। এই পাঁচটি চিত্তবৃত্তিতে অক্লিষ্ট দ্বারা ক্লিষ্টকে দূর করতে হয়। পরে অক্লিষ্টকে নিরোধ করে যোগসিদ্ধপথে যেতে হয়। প্রমাণবৃত্তি— প্রত্যক্ষ-প্রমাণ, অনুমান-প্রমাণ ও আগম-প্রমাণ— এই তিন ভাগে বিভক্ত। বিপর্যয়বৃত্তি হলো— বস্তুর স্বরূপকে না জেনে অন্য বস্তু হিসেবে বিপরীত জ্ঞান লাভ করা। একমাত্র প্রমাণবৃত্তি বিপর্যয়বৃত্তিকে নাশ করে। অবিদ্যমান বস্তুকে শুধুমাত্র শব্দজ্ঞানের ভিত্তিতে কল্পনা করাকে বলা হয় বিকল্প। যে অবস্থায় মানুষের কোনো জ্ঞান থাকে না কিন্তু ওই জ্ঞান না থাকার জ্ঞান চিত্তবৃত্তির মধ্যে সজাগ থাকে তা হলো নিদ্রাবৃত্তি। ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট— এই দুই ভাগে নিদ্রাবৃত্তিকে ভাগ করা হয়। পূর্বানুভূতি বিষয়ের পুনরুত্থান ঘটাকে বলে স্মৃতি।

চিত্তবৃত্তি নিরোধের দুটি উপায়— অভ্যাস ও বৈরাগ্য। বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা চিত্তবৃত্তির সমাধান ঘটিয়ে গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতার মাধ্যমে সবিতর্ক সমাধি, নির্বিতর্ক সমাধি ও নির্বিচার সমাধি পথ শেষে সম্প্রজ্ঞাত যোগ স্তরে নিয়ে যায়। ভক্তিপূর্বক বিশ্বাস এবং শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্যে সমাধিপজ্ঞা বা ঋতম্ভরা হওয়া যায়। ক্লেশ পাঁচ প্রকার— অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। কর্ম চার প্রকার— পুণ্য, পাপ, পুণ্য ও পাপমিশ্রিত এবং পাপপুণ্যরহিত। কর্মফল হলো— বিপাক। কর্মসংস্কার হলো— আশ্রয়। বস্তুর চেয়ে অন্য বিরাট বস্তু হলো— সাতিশয়। বস্তুর চেয়ে অন্য বিরাট বস্তু না থাকা হলো— নিরাতিশয়। সাধনার ক্ষেত্রে নয়টি বিঘ্ন এসে উপস্থিত হয়— ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরত, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব। এছাড়া 'বিক্ষেপসহভূ' নামে পাঁচটি বিঘ্ন আগের নয়টি বিঘ্নের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, সেগুলি হলো— দুঃখ (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক), দৌর্মনস্য, অঙ্গমেজয়ত্ব, শ্বাস ও প্রশ্বাস। মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণযোগ্য পদার্থ হলো দুই প্রকার— স্থূল ও সূক্ষ্ম। সমাধিপাদযোগের স্বরূপ, ভেদ, ফল, উপায়ভূত অভ্যাস, বৈরাগ্য ইত্যাদি রীতি শুদ্ধ অন্তঃকরণে মেনে নির্বীজ সমাধি লাভ করা যায়।

সাধারণ সাধকের বা সাধারণ মানুষের সাধনার পথ এবং যে পথের মাধ্যমে মনকে পরিপূর্ণ শুদ্ধ করে নির্বীজ সমাধিলাভের উপায় প্রকাশিত হয় তা হলো— সাধনপাদ। সাধারণ মানুষ তার ক্রিয়াযোগের মাধ্যমে তপ, স্বাধায়, ঈশ্বর প্রণিধান— এই তিন যম, নিয়ম ইত্যাদি যোগাঙ্গ সমূহের মধ্যে নিজেকে লিপ্ত করতে পারে। জীবমাত্রই অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশের মাধ্যমে সংসারচক্রে আবির্তিত হতে থাকে যা সত্যিই বিশেষ মহাদুঃখদায়ক। চিত্তে বীজরূপে ক্লেশ থাকা সত্ত্বেও যখন কার্যকরী হয় না তখন তাকে বলা হয় 'প্রসুপ্ত'। ক্ষীণ শক্তিযুক্ত ক্লেশ হলো 'তনু'। উদার ক্লেশের স্থায়িত্ব সময়ে যখন অন্য ক্লেশ দমিত অবস্থায় থাকে তখন সেই অবস্থাকে বলে—

‘বিচ্ছিন্নাবস্থা’। ক্লেশের সুষ্ঠু কাজ করে যাওয়া হলো— ‘উদার’। দৃক্‌-শক্তি অর্থাৎ দ্রষ্টাপুরুষ এবং দর্শন-শক্তি অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্ব ভিন্নাবস্থায় থাকে। দ্রষ্টা চেতন ও বুদ্ধিজড়। অবিদ্যার কারণে এদের একবলে মনে হলেও কোনোভাবেই এদের একতা সম্ভব নয়। পুণ্যকর্ম ও পাপকর্ম উভয়েই হলো কারণ। পুণ্যকর্মের পরিণাম সুখদায়ক। পাপকর্মের পরিণাম দুঃখদায়ক। রাগ-দ্বেষ-হিংসা হলো— পরিণামদুঃখ। ভয়, ঈর্ষা হলো— তাপদুঃখ। ভোগসংস্কার আসক্তি বৃদ্ধিকারী দুঃখ হলো— সংস্কার দুঃখ। গুণের কার্য হলো পরস্পরবিরোধী, তাই এদের ‘গুণবৃত্তিবিরোধ’ রূপে দেখা হয়।

বিবেকী পুরুষ সমস্ত দুঃখরূপী অবস্থাকে ‘কর্মবিপাক’ বলে মনে করেন। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ হলো পাঁচ স্থূলভূত। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচ হলো— তন্মাত্র। তন্মাত্রের সঙ্গে যখন ‘অহংকার’ যুক্ত হয় তখন ওই ছয়টিকে বলে ‘অবিশেষ’। কেবলমাত্র সত্তার দ্বারা যা উপলব্ধি হয় তা হলো— ‘লিঙ্গমাত্র’। উপনিষদ ও গীতায় এই অবস্থার নাম অব্যক্ত। চৈতন্যমাত্র, সর্বথাশুদ্ধ, নির্বিকার স্বরূপ বুদ্ধির সংস্পর্শে এসে বুদ্ধিবৃত্তির অনুরূপ হয়ে যায় বলে তাকে বলা হয় ‘দ্রষ্টা’। দ্রষ্টার জন্যই দৃশ্যের স্বরূপ। স্বরূপার্থক যথার্থ জ্ঞানই হলো ‘বিবেকজ্ঞান’। এই বিবেকজ্ঞান যখন সমাধির নির্মলতা ও স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয়ে পূর্ণ ও নিশ্চল হয়ে লেশহীন হয় তখন সেই জ্ঞান হলো ‘অবিপ্লব বিবেক জ্ঞান’। যোগীপুরুষের চিত্তে যখন বিবেক জ্ঞানের স্থিতি জাগরিত হয় তখন তাঁর বোধ জাগ্রত হয়। যে বোধ বিমুক্তির দ্যোতক তা হলো ‘কার্য বিমুক্তিপ্রজ্ঞা’ এবং যে বোধ চিত্তবিমুক্তির দ্যোতক তা হলো ‘চিত্তবিমুক্তিপ্রজ্ঞা’। কার্যবিমুক্তি প্রজ্ঞার চার অবস্থা। সেই চার অবস্থা হলো— জ্ঞেয়শূন্য অবস্থা, হেয়শূন্য অবস্থা, প্রাপ্যপ্রাপ্ত অবস্থা, চিকীর্ষাশূন্য অবস্থা। চিত্ত বিমুক্তিপ্রজ্ঞার তিন অবস্থা— চিত্তের কৃতার্থতা, গুণশীলতা, আত্মস্থিতি। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ— এই পাঁচটি পালনীয় অবস্থা হলো যমাঃ বা যম।

ভিতর ও বাহির শুদ্ধির জন্য শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর কারণাগতি এই পাঁচটি নিয়ম অবশ্যপালনীয়। প্রাণায়ামের সাধারণ লক্ষণ হলো প্রাণবায়ুর গমনাগমন ক্রিয়া রুদ্ধ হওয়া। মনে রাখতে হবে, আসনে স্থিরতা অভ্যাস তৈরি হলেই প্রাণায়াম অভ্যাস শুরু করার যোগ্যতা অর্জন করা যায়। বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি, স্তম্ভবৃত্তি হলো প্রাণায়াম সাধনার নানা ভেদ। বাহ্যবৃত্তি প্রাণায়ামের আর এক নাম ‘রেচক’ অর্থাৎ রেচনপূর্বক প্রাণরোধের অবস্থা। আভ্যন্তরবৃত্তি প্রাণায়ামের আর এক নাম ‘কুম্ভক’ অর্থাৎ প্রাণবায়ু ভিতর ও বাহির সবদিক থেকেই সুখপূর্বক রুদ্ধ রাখার অভ্যাস। প্রাণায়াম অভ্যাস মন ও ইন্দ্রিয়কে শুদ্ধ করে। এইরূপ শুদ্ধভাবে জয়ী হতে হতে ইন্দ্রিয়ের বাহ্যবৃত্তি শুধুমাত্র মনে বিলীন করার নাম ‘প্রত্যাহার’। প্রত্যাহার সিদ্ধ হতে পারলে ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণভাবে নিজের বশীভূত হয়।

বিভূতিপাদ হলো অন্তরঙ্গ সাধন। নাভিচক্র, হৃৎপদ্ম হলো শরীরের অভ্যন্তরদেশ। সূর্য, চন্দ্র, আকাশ ইত্যাদি হলো বাইরের দেশ। চিত্তবৃত্তিকে যে কোনো একটি দেশে স্থির রাখা হলো— ধারণা। ধ্যেয়বস্তুতে চিত্তকে নিবিষ্ট করা হলো— ধ্যান। ধ্যানের মাধ্যমে ধ্যেয়মধ্যে যখন চিত্ত মিলেমিশে একাকার হয় তখন তা হলো— সমাধি। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি ধ্যেয়র মধ্যে একাগ্র চিত্তে প্রবেশ করানো হলো— সংযম। ধর্মীর মধ্যে এক ধর্ম লয় হয়ে অন্য ধর্মের উদয় হওয়া হলো— ধর্মপরিণাম। ধর্ম-পরিণামের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে প্রবেশ করা হলো— লক্ষণ-পরিণাম। এক পরিণাম থেকে অন্য পরিণামে সূক্ষ্ম থেকে আরও সূক্ষ্ম অবস্থার পরিবর্তিত রূপ হলো— অবস্থা- পরিণাম। যখন ধর্মীর মধ্যে ধর্ম শক্তিরূপে থাকে কিন্তু নির্দিষ্টভাবে ব্যবহার নির্দেশে আসে না তাকে বলা হয়— অব্যপদেশ্য বা অনাগত। ধর্মীর মধ্যে ধর্ম পূর্ব থেকেই সুপ্ত অবস্থায় থেকে কার্য উপলক্ষ্যে প্রকটিত হলে তাকে ‘উদিত’ বা ‘বর্তমান’ বলা হয়। ধর্ম যখন তার কাজ শেষ করে ধর্মীর মধ্যে বিলীন হয় তখন তাকে ‘শান্ত’ বা ‘অতীত’ বলে। ওই তিন স্থিতিতেই ধর্মী সদা অনুগত অবস্থায় থাকে। কর্মের ফল হিসেবে মানুষের আয়ু ‘সোপক্রম’ ও ‘নিরুপক্রম’ এই দুই প্রকারে নির্দিষ্ট হয়।

মানব জীবনের তিন প্রকারের ভাবনা— মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা। উপেক্ষা হলো ভাবনার ত্যাগ রূপ। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অত্যন্ত সূক্ষ্মবস্তু, অন্তরালস্থিতবস্তু, দূরে অবস্থিত বস্তু— এই তিন ধরনের বস্তু প্রত্যক্ষ করা যায়। সংযম সাধনায় সাধিত হলে যে ক্ষেত্রে সংযম প্রয়োগ করা হবে তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করা যাবে। নাভিচক্রে সংযম করতে পারলে যোগী নাড়ীজ্ঞানী হয়ে ওঠেন। ব্রহ্মরন্ধ্রে সংযম করলে ঐশ্বরিক শক্তির সাক্ষাৎলাভ হয়। সংযম দ্বারা প্রতিভাসিদ্ধিলাভ করলে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, সূক্ষ্ম, গুপ্ত, অন্যস্থানে আছে এমন বস্তু প্রত্যক্ষ হয়। শ্রাবণ সিদ্ধিলাভ দিব্যশব্দ শ্রবণ শক্তিলাভ করা যায়। বেদনসিদ্ধি দ্বাা দিব্যস্পর্শ অনুভব করা যায়। আদর্শসিদ্ধি দ্বারা দিব্যরূপ দর্শন করার শক্তি জেগে ওঠে। আস্বাদসিদ্ধি দ্বারা দিব্যরস অনুভব শক্তি জাগ্রত হয়।

বার্তাসিদ্ধি দ্বারা দিব্যগন্ধ অনুভব শক্তি জেগে ওঠে। মানব শরীরে জীবনের আধার হলো প্রাণ। নাভি থেকে পা পর্যন্ত প্রাণবায়ু চলাচল শক্তি হলো— অপান। হৃদয়দেশ থেকে নাভি পর্যন্ত প্রাণবায়ুর সঞ্চালন হলো— সমান। প্রাণবায়ুর শরীরের সমস্ত নাড়ীতে সঞ্চালন ক্রিয়া হলো— ব্যান। কণ্ঠ থেকে মস্তক পর্যন্ত প্রাণবায়ুর ঊর্ধ্বগামী সঞ্চারিত ক্রিয়া হলো— উদান। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ— এই পঞ্চভূতে সংযমী যোগী স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয়, অর্থবস্তু— এই পাঁচ প্রকার অবস্থায় সংযম প্রয়োগের দ্বারা বিজয় লাভ করতে পারে। সিদ্ধিলাভের আটটি ক্ষেত্র। যোগীকে এই অষ্টসিদ্ধি লাভ করতে হয়। যেমন— ‘অণিমা’ অর্থাৎ শরীরের অনুসদশ ধারণ করার ক্ষমতা। ‘লখিমা’ অর্থাৎ শরীরকে

হালকা করার ক্ষমতা। ‘মহিমা’ অর্থাৎ শরীরকে বৃহৎ করার ক্ষমতা। ‘গরিমা’ অর্থাৎ শরীরকে ভীষণ ভারী করতে পারার ক্ষমতা। ‘প্রাপ্তি অর্থাৎ কল্পনামাত্র ভৌতিকদ্রব্য প্রাপ্তিলাভের সামর্থ্য। ‘প্রকাম্য’ অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থ সম্বন্ধীয় ইচ্ছার অনায়াস পূর্তিলাভ। ‘বশিত্ব’ অর্থাৎ সমস্ত কিছুকে নিজের বশীভূত করতে পারার ক্ষমতা। ‘ঈশিত্ব’ অর্থাৎ ভূত ও ভৌতিক পদার্থকে নানাভাবে উৎপন্ন এবং তাদের শাসন করার ক্ষমতা।

গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অন্বয়, অর্থবস্তু— এই পাঁচ অবস্থায় সংযম ক্রিয়া সাধন করলে মন-সহ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপর বিজয়লাভ করা যায়। সেই ইন্দ্রিয়জয়ী তখন ‘মনোজবিত্ব’ অর্থাৎ মনের সদৃশ্য গতি, ‘বিকরণভাব’ অর্থাৎ শরীর ছাড়াই অনুভব করার শক্তিলাভ এবং ‘প্রধানজয়’ অর্থাৎ প্রকৃতির উপর অধিকার লাভ— এই তিন সিদ্ধির প্রাপ্তি লাভ করেন। ‘গ্রহীতৃ-বিষয়ক’ সমাধির দ্বারা ‘বিবেকজ্ঞানস্থিতি’ লাভ করা যায়। এরপর যোগী ‘সর্বজ্ঞ’ অবস্থায় যান এবং সেখান থেকে যোগসাধনার মাধ্যমে ধর্মমেঘ-সমাধি’ স্তরে পৌঁছান। কালের সর্বোত্তম ক্ষুদ্র বিভাগ হলো— ‘ক্ষণ’। এক ক্ষণের ধ্বংস হয়ে অন্য ক্ষণের আবির্ভাব হলো— ‘ক্রম’। বস্তুর জাতি, বস্তুর লক্ষণ অর্থাৎ বর্ণ, আকৃতি ইত্যাদি। বস্তুর দেশ অর্থাৎ স্থান— এই তিনের দ্বারা বস্তুর ভিন্নতা অনুভব করা যায়। পরবর্তী ধাপে যোগী ‘সর্ববিষয়ম্’- ‘সর্বথাবিষয়ম্’- ‘আক্রমম্’-‘পুরুষখ্যাতি’ ইত্যাদি জ্ঞানলাভ শেষে সংসারসমুদ্র হতে মানবের ‘মুক্তিদায়ক’ রূপ অবস্থায় পৌঁছে যান।

কৈবল্যপাদে সমস্ত সিদ্ধির মূল পাঁচটি কারণ— জন্মগতসিদ্ধি, ওষধি বিশেষের দ্বারা প্রাপ্ত সিদ্ধি, মন্ত্র দ্বারা প্রাপ্ত সিদ্ধি, তপঃপ্রভাবে প্রাপ্ত সিদ্ধি, সমাধি দ্বারা প্রাপ্তসিদ্ধি বিশ্লেষিত হয়েছে। এইসব সিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগীর শরীর-ইন্দ্রিয়-চিত্তে অনন্যসাধারণ পরিবর্তন ঘটিয়ে পরিণামান্তর পথে নিয়ে যায়। একে ‘জাতি-অন্তর-পরিণাম’ বলা হয়। জন্ম-ওষধি-মন্ত্র-তপঃ-সমাধি— এই পাঁচটি কারণের দ্বারা, শরীর-ইন্দ্রিয়-চিত্তে বিশেষ বিশেষ উৎকর্ষ দেখা দেয়। কর্মফল সুখদায়ী হলে-‘শুক্লকর্ম’, কর্মের ফল দুঃখভোগের কারণ হলে-‘কৃষ্ণকর্ম’। সিদ্ধযোগীর কর্ম অশুক্ল এবং অকৃষ্ণ হয়। যোগী দ্বারা এবং সাধারণ মানুষের দ্বারা তিনরকম কর্ম সাধিত হয়। সেই তিনরকম কর্ম হলো— শুক্ল অর্থাৎ পুণ্যকর্ম, কৃষ্ণ অর্থাৎ পাপকর্ম এবং শুক্লকৃষ্ণ অর্থাৎ পাপ-পুণ্য মিশ্রিত কর্ম। গুণের পরিণাম ক্রমের সমাপ্তি যে অবস্থায় ঘটে তার নাম ‘কৈবল্য’। যে অবস্থা যোগীকে সমস্ত রকম গুণ ভোগ করিয়ে ‘অপবর্গ’ অর্থাৎ মুক্তি প্রদান করে— যে অবস্থায় যোগী হন ‘কেবল’ অর্থাৎ নির্গুণ’। নির্গুণ লাভে অনাদিসিদ্ধি অবিদ্যাকৃত সংযোগ ছিন্ন হয়ে নিজ স্বরূপে অর্থাৎ আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়।

পাতঞ্জল দর্শনের সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ হলো মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত যোগদর্শন। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও মোক্ষলাভের উপায়। ঈশ্বরই একমাত্র ধ্যেয় ও জ্ঞেয়। আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ, নিত্য, স্বপ্রকাশ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও অপরিণামী। দেহ, মন ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি বা জড়জগতের যে কোনো বস্তু থেকে আত্মা হলো ভিন্ন। আত্মাকে সমস্ত কিছু থেকে আলাদা বলে জানার যে জ্ঞান, তার নামই বিবেক জ্ঞান। যোগী যোগবলে কায়ব্যূহ রচনা করতে পারেন। অর্থাৎ বহু শরীর রচনা করতে পারেন। মোক্ষই হলো দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। ঈশ্বরই একমাত্র পরমপুরুষ। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে সৃষ্টির উদ্ভব হয়। উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা প্রলয় বা ধ্বংসের সূচনা করে। জীবের কর্মফল অনুসারেই ঈশ্বর প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে সৃষ্টি সম্পন্ন করেন, তিনিই উভয়ের মধ্যে বিয়োগ সাধন করে সৃষ্টিনাশ করেন।

এই যে মানব-জীবন তার হৃদয়ে, মনে, প্রাণে, শরীরের প্রতিটি কণায়, স্পন্দনে, বিন্দুতে আভাসে, কর্ণাকাশে; আবার বাইরে সর্বত্রই ঈশ্বর বিরাজমান। বিবেকজ্ঞানসিদ্ধি দ্বারা তাঁর সঙ্গে সংযোগ ঘটে। তাই আমাদের সকলের একান্ত কামনা হয়ে উঠুক— প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রীতিলাভের আকাঙ্ক্ষা জাগুক; আমরা সবসময় যেন ঈশ্বরের প্রকাশে এবং ঈশ্বরের বিকাশে বেঁচে থাকতে পারি। আমরা কেউই এই জীবনের স্থিতি, গতি, পরিণতি সম্বন্ধে জানি না। আমরা কেউই ধ্বংস চাই না, শুধুমাত্র সৃষ্টির সাধনায় বেঁচে থাকতে চাই। ঋগ্বেদ (৫/৫৩/১) মানবকল্যাণে সুপ্রাচীনকাল থেকেই উচ্চারিত করে চলেছে— কো নে জানম এষম কো বা পুরা সুস্নেষু অন মরুতাম।/যৎ যুযুজ্রে কিলান্য।। ঋগ্বেদ পরমানন্দের গতিময় রথ। সেই রথে আমাদের জীবনরথ জুড়ে দেবার আবেদন জানাচ্ছে। কারণ মানবজীবন মহান কিছু প্রশ্নের উত্তর না জানা (অন্ধকারাচ্ছন্ন) অবস্থায় থাকে। জীবনের স্থিতি, গতি, পরিণতি আমরা জানি না। প্রাণের নিত্য ক্ষয় ও বৃদ্ধি সেও তো ওই প্রাণের সন্ধানের জন্যই। তাই পরমানন্দের সঙ্গে আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই-ই, চাই। পাতঞ্জল যোগদর্শন আত্মচৈতন্য নির্মাণের এক প্রামাণ্যপথ অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরমানন্দের কাছে মিলেমিশে একাকার হবার এক আলোকিত মার্গ। □

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বিজ্ঞান সাধনা ও দর্শনতত্ত্ব

দীপক খাঁ

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথাগত শিক্ষা বিজ্ঞানের বিষয়ে। অধ্যাপনাও বিজ্ঞান বিষয়ে। রিপন কলেজে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক রূপেই তাঁর কর্মজীবন শুরু। কিন্তু প্রথাগত শিক্ষাকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করে তার দার্শনিক নির্যাস ছাত্রদের মধ্যে ও সাধারণ পাঠকসমাজে সঞ্চারিত করা এক কথা নয়। দর্শনের শুরু বিজ্ঞানের শেষে। ত্রিবেদী মহাশয়ের জীবনেও আমরা এটাই দেখতে পাই। ত্রিবেদী মহাশয় দুই প্রকার সত্যের নির্দেশ করেন। এক, ব্যাবহারিক বা Pragmatic সত্য। জীবনধারণের সুবিধার জন্য মেনে নেওয়া সত্য; আর দুই, পারমার্থিক বা শাশ্বত সত্য absolute truth........ কিন্তু তাঁর প্রতিভা এই দুই বিভাগেই আবদ্ধ ছিল না। ইতিহাসে তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। বাংলাভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধেও ত্রিবেদী মহাশয় অনেক পরিশ্রম করেছেন। তাঁর এক ছাত্র প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে ধরা আছে তাঁর পাঠন রীতি — 'তিনি আমাদিগের মনকে নূতনের দিকে' আকৃষ্ট করিতেন। নূতনের মোহে আমরা নূতন জিনিসটিকে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। দর্শনজনিত আনন্দ আমাদিগের কৌতূহলী মনকে জিনিসটার স্বরূপ জানিবার জন্য ব্যগ্র করিত। ..... কৌতুহল না জন্মিলে জিনিসের প্রকৃত তথ্য যে কী তাহা জানিতে পারা যায় না। এই জিনিসটা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি প্রথমে পরীক্ষা দেখাইয়া, পরে পরীক্ষিতব্য বিষয়গুলি বক্তৃতা দ্বাবা বুঝাইয়া দিতেন।' অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন--- 'রামেন্দ্রবাবু বৈজ্ঞানিক ছিলেন। ...... যেমন বিজ্ঞান বুঝিতেন ও বুঝাইতেন, তেমন আর কেহ এ দেশে পারিয়াছেন কি না জানি না। তবে তাঁহার যেমন মাথা ছিল, তাহাতে উচ্চতর বিজ্ঞানের সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর একজন প্রজ্ঞাপতি হওয়াটাই উচিত ছিল।

নিউটন, ডারউইন, ম্যাক্সওয়েল প্রভৃতি এইরূপ একজন প্রজ্ঞাপতি। যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে বিজ্ঞানের সৃষ্টি না করলেও,

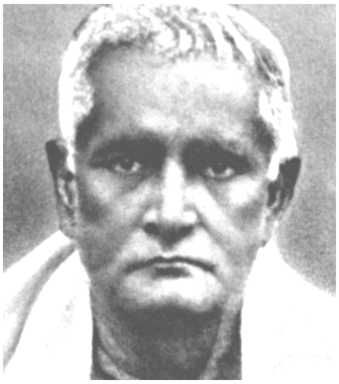

বিজ্ঞানের বীজমন্ত্রগুলি যাঁহাদের ধ্যানে যথাযথভাবে আবির্ভূত হয়, তাঁহারা বিজ্ঞানের ঋষি, আর যাঁহারা শিষ্য যজমানের কল্যাণ কামনায় সেই মন্ত্রগুলির যথাযথ বিনিয়োগ করিতে পারেন, তাঁহারা বিজ্ঞানের আচার্য ও পুরোহিত।'

বিজ্ঞান না দর্শন, এ তাঁর বিচারাধীন নয়। জ্ঞানই পরম সত্য। পরম আনন্দদায়ক এক অভিজ্ঞতা। তাঁর নিজের ভাষায়---'আমি বৈজ্ঞানিকতার স্পর্ধা রাখি না; কিন্তু আমি বৈজ্ঞানিকতাজীবী বিজ্ঞানভিক্ষু। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণ ব্যবহারিক বিদ্যায় আমার নিকট অগ্রাহ্য।'

অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বলেছেন— 'আমি জানিতাম প্রচলিত যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালীর উপর তাঁহার মোটেই আস্থা ছিল না, অথচ তিনি রিপন কলেজটিকে কেন এত প্রাণের বস্তুর মত আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, ভিতরে আসিয়া সে রহস্যের সন্ধান পাইলাম। যে অল্প কয়েকটি ছাত্র বি এস.সি ক্লাসে তাঁহার বিজ্ঞান ব্যাখ্যান শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিত, তাহাদের অধিকাংশের সহিতই তিনি আত্মীয়তা স্থাপন করিতেন।'

১৩১০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর অমূল্য দার্শনিক প্রবন্ধের সংকলন---'জিজ্ঞাসা'। সেখানে বিজ্ঞানের দুরূহ ও জটিল তত্ত্বকে তিনি বাংলা ভাষার মাধ্যমেই আলোচনা করেছেন এবং সেটা যে খুবই উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান আলোচনা তাও প্রমাণিত। জড় ও জীব জগতের রহস্য সন্ধানে তিনি যেমন বিজ্ঞানমনস্ক তেমনি দর্শনঋদ্ধ। রামেন্দ্র সুন্দরের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে সত্য ও দর্শন এমন প্রজ্ঞায় প্রকাশিত যে সেটা হয়ে ওঠে চিরন্তন— বিজ্ঞানের দর্শনই তার উপজীব্য।

তিনি রিপন কলেজে একটি অধ্যাপক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে তিনি ও অন্য কোনো অধ্যাপক মাঝে মাঝে কোনো প্রবন্ধ লিখে এনে পাঠ করতেন। তিনি যে প্রবন্ধগুলি পাঠ করেছিলেন, পরে তাই 'জগৎ কথা' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলি সবই দর্শনাশ্রিত বিজ্ঞান অথবা বিজ্ঞান-সংপৃক্ত দর্শন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন, 'দর্শন ও বিজ্ঞানের এমন অপূর্ব সমন্বয়, শুধু আমাদের দেশ নহে, পাশ্চাত্য জগতেও বিরল। রামেন্দ্রসুন্দর 'বের্গসর'-এর মত দার্শনিকের কিংবা গ্রেগর জোহন মেন্ডেলের মতো পাদরি বিজ্ঞানীর বংশগতির তত্ত্ব কোনটাই উপেক্ষা করেননি। সজীব চিত্তের ও চিন্তার অধিকারী শ্রীত্রিবেদী সাহিত্যে যতখানি পারঙ্গম, বিজ্ঞান ও দর্শনেও ততখানি সমমনস্ক।

বিজ্ঞানের সদর দরজা দিয়েই তাঁর সাহিত্য মন্দিরে প্রবেশ। তিনি প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য এবং আধুনিক বিজ্ঞানকে তুলনা করেছেন ব্রহ্মাণ্ডের দার্শনিক প্রশ্নে। ব্রহ্মাণ্ড কী? এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁর কথা—'প্রাচীন বৈদান্তিক বলিয়াছেন, এ মায়া; আধুনিক বৈজ্ঞানিকরা বলেন ইহা অজ্ঞেয়। বিজ্ঞান ও দর্শনের একমাত্র উত্তর—'আমি জানি না'। তাঁর প্রতিটি বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত বিশ্বজগৎকে ঐক্যের বাঁধনে বাঁধিতে পারেনি। তাঁর 'বাঙ্ময় জগৎ'-এ, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন বৈজ্ঞানিক যে ব্যবহারিক জগতের কথা বলেন তাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে কোনোদিনই ধরা যায় না। এই জগত সংজ্ঞায় তৈরি, বাক্যে তৈরি— ইন্দ্রিয়ের অগোচরে এই অপ্রত্যক্ষ জগৎকে বিজ্ঞান বিদ্যা 'জড়জগৎ' আখ্যা দিয়েছে। এই জড় জগতের মধ্যে যে ফাঁকি তাকে ধরবার চেষ্টা তাঁর। 'প্রাণময় জগৎ'-এ তিনি প্রাণের ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিশদ ও অনুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন, তা অপূর্বতক দার্শনিক নিবন্ধ ছাড়া আর কিছু নয়। □

হিমসাগর

জামাইষষ্ঠী মানেই বাঙ্গলার বাজারে আমের বৈচিত্র্য

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষ আমের জাত বৈচিত্র্যে সব চাইতে ধনী। এ দেশে এক হাজারেরও বেশি কলম-সক্ষম জাত বা ক্লোন রয়েছে। তাদের আকার, আয়তন, খোসার রং, পাকার মরশুম, আঁটির আকার, শাঁসের উৎকর্ষতা, ফলন ও ফলের নিয়মানুবর্তিতায় নানান বৈচিত্র্য আছে। এত বিপুল বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও তার মাত্র কয়েকটিই অর্থকরীভাবে গুরুত্বপূর্ণ জাত বলে বিবেচিত হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাইষষ্ঠীকে কেন্দ্র করে বাঙ্গলার হাটে বাজারে আমদানি হয় বিবিধ বৈচিত্র্যের আম, তার অধিকাংশই বাঙ্গলায় জন্মানো আমের জাত- প্রকরণ।

দেশের অঞ্চলভেদে অর্থকরী জাত পৃথক। কারণ একটি নির্দিষ্ট জাত দেশের সর্বত্র সকল কৃষ্টি-জলবায়ুতে সমান ফলন দেয় না। কলমের তৈরি প্রায় সকল জাতের আম নির্বাচিত হয়েছে প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত সম্ভাবনাময় উন্নত গুটি-আম (Chance Seedling) থেকে। এগুলির কোনো কোনোটি অতি জলদি, নাবি বা লেট, কিংবা ফলের মান উৎকর্ষতর। অর্থকরী জাত না হলেও কিছু উন্নত জার্মপ্লাজম আম-বিলাসী ও চারা-কুশলীদের বাগানে এখনো টিকে আছে। এগুলি প্রজননের কাজে ব্যবহার করা দরকার। নির্বাচিত জাতের নামকরণ করেছেন হয়তো কোনো আগ্রহী চাষি, বাগানবিলাসী কিংবা চারা-কুশলী বা নার্সারিম্যান। তাদের দেওয়া নামে উৎকর্ষতা প্রাধান্য পেয়েছে। কখনো স্থাননাম, রাজা-বাদশা-নবাবের নাম এবং বর্ণবৈচিত্র্য লৌকিক জাতগুলিকে অনন্যমাত্রা দিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নামগুলি এসেছে স্থানীয় কথ্যভাষা থেকে।

আমে ইতর পরাগযোগে (Cross Pollination) বীজ উৎপন্ন হওয়ায় কাঙ্ক্ষিত গুণের সমন্বয়ী নতুন জার্মপ্লাজম পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের মানুষ চুষে খাওয়ার আমই পছন্দ করে এসেছে। সেই আম খেয়ে বীজটি মাটিতে চাপা দিত, তা থেকে বেরোতো নতুন আমের গাছ। যে গাছ থেকে উচ্চমানের ফল পাওয়া যেত সেগুলিকে রেখে নিকৃষ্ট মানের গাছগুলি অন্য কাজে ব্যবহৃত হতো। এ ভাবেই জাত উন্নয়নের সূত্রপাত ঘটল।

আমের জাতগুলির মধ্যে সামগ্রিকভাবে ব্যাপক অভিযোজন ক্ষমতা থাকলেও দেশের সুনির্দিষ্ট অঞ্চলেই তা ভালো ফল দেয়। দেখা গেছে, রত্নাগিরির আলফানসো আমের কাঙ্ক্ষিত উৎকর্ষতা কঙ্কন উপকূলের বাইরে বজায় রাখা আদৌ সম্ভব হয়নি। দক্ষিণ ভারতীয় আমের জাতগুলি উত্তর ভারতে ফুল-ফল দিলেও কিছু বৈশিষ্ট্য বদলে যায়। আবার উত্তর ভারতের জাতগুলি যদি দাক্ষিণাত্যে লাগানো হয় তবে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভেদ চোখে পড়বে। উত্তর ভারতের ল্যাংড়া ও দশেরী আম দক্ষিণে লাগালে তার পুষ্পায়ন হ্রাস পায়। অথচ ল্যাংড়া জাতটি উত্তর ভারতের বারাণসী, সাহারানপুর কিংবা বুলসার যেখানেই লাগানো হোক না কেন তার প্রদর্শন সাফল্য মোটামুটি একই রকম। দক্ষিণের 'নীলাম' জাতটি উত্তর ভারতে বেশ খর্বাকার হয়ে জন্মায়। দক্ষিণের 'রুমানি' জাতটি উত্তর ভারতে জন্মালে ফুলে স্ত্রী-পুরুষ যৌন অনুপাত পরিবর্তিত হয়। এতে রুমানির ফলন কমে যায়।

ফঃ ৫

দেশের সবচাইতে পরিচিত জাতগুলি হচ্ছে ল্যাংড়া, আলফানসো, দশেরী ও বাঙ্গানপল্লী। উত্তর ভারতের পছন্দের জাতগুলি হচ্ছে--- বোম্বাই গ্রিন, ল্যাংড়া, দশেরী সামার বহিস্ত চৌসা, পূর্ব ভারতের ফজলি, কৃষাণভোগ, হিমসাগর, ল্যাংড়া, গুলাবখাস, জর্দালু; পশ্চিম ভারতের আলফানসো, পাইরি, মানকুরাদ, কেশর, রাজাপুরি, জমাদার; দক্ষিণ ভারতের বেনেশান (বাঙ্গানপল্লী), নীলাম, ব্যাঙ্গালোরা (তোতাপুরী), রুমানি, সুবর্ণরেখা, মালগোয়া, রাসপুরি, বাদামী।

ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা সুস্বাদু আম সম্ভবত দশেরী। দক্ষিণ ভারতের সবচাইতে সুস্বাদু আম আলমপুর বেনেশন, হিমায়ুদ্দিন এবং জেহাঙ্গীর হলেও সেগুলির কোনোটিই অর্থকরী নয়। এদের ফলন-লাজুকতা এর একমাত্র কারণ। দক্ষিণের জাতগুলির মধ্যে নীলাম এবং ব্যাঙ্গালোরা সবচাইতে নিয়মিত ফলদায়ী। কয়েকটি স্বল্প পরিচিত ভালো জাত হচ্ছে ফজরী জাফরানি, আমন কুর্দ, বুলন্দবাগ, জামুরাদ, সোনাতল, নিসার পসন্দ, আজিজ পসন্দ প্রভৃতি। চুষে খাওয়ার উপযোগী কয়েকটি ভালো জাত হচ্ছে উত্তর প্রদেশের রসপুনিয়া, মিঠা সুন্দরশা, মিঠা গাজিপুর, হার্দিল আজিজ, লক্ষ্ণৌ সফেদা; অন্ধ্র প্রদেশের চীনা রসম, চেরুকরসম, পেড্ডারসম; গুজরাটের রাজাপুরী। আমের ক্ষেত্রে একটি জাতের একাধিক সমনাম থাকার দরুন নামকরণে বেশ বিভ্রান্তি জন্মায়। একই জাতকে ভিন্ন ক্যাটালগে ভিন্ন নামে দেখানো হয়। কলমের গাছ ভিন্ন স্থানে ভিন্ন লোকের হাত ঘুরে সমনাম ছড়িয়ে যায়।

কলমকারী অনেক ক্ষেত্রে নতুন নাম দিয়ে বসে। তাতে সমস্যা আরও বেড়ে যায়। যেমন ল্যাংড়ার সমনামগুলি হলো--- ল্যাংড়া বানারসী, ল্যাংড়া হাজিপুরী, ল্যাংগারহি, টিকারী (ফারাক্কাবাদ, উত্তরপ্রদেশ), ডেভিড ফোর্ড, হরদিল আজিজ (ভূপাল), ল্যাংড়া হর্দই, ল্যাংড়া পাটনা, সিলেট (মীরাট, উত্তরপ্রদেশ), ল্যাংড়া ফকিরওয়ালা, রু-এ-আফজা, দ্বারভাঙ্গা, ছাটপা। দশেরীর সমনামগুলি হচ্ছে আমন, আমন দশেরী, নিরালী আমন, কাম্যাব। বোম্বাই গ্রীনের সমনামগুলি হচ্ছে কালি বোম্বাই, হীরালাল বোম্বাই, সিরৌলী, মালদা, বোম্বেশা, বোম্বে কালান, বাঁশি বোম্বাই, শিরি ধান, ভোজপুরী, বোম্বাই ভোজপুরী, লায়লা আলুপুর প্রভৃতি। রত্নাগিরির আলফানসোকে বিভিন্ন জায়গায় হাফুস, আফুস ও বাদামি বলে চেনে। তেমনই পাইরি, পিটার ও পিটার পসন্দ আসলে একই জাতের ফল। তোতাপুরীর সমনামগুলি হচ্ছে ব্যাঙ্গালোরা ও কালেক্টর। বেনেশানের অন্য নামগুলি হচ্ছে বাঙ্গানপল্লী, সফেদা ও চাপ্তা। 'মালদা' নাম ব্যবহার করে দুটি জাতকে বোঝানো হয়--- মালদার ফজলী এবং উত্তরপ্রদেশের বোম্বাই গ্রিন। আবার লক্ষ্ণৌ ও মালিহাবাদের সফেদা অন্ধ্রপ্রদেশের বানেশন (বেনেশান) থেকে আলাদা হলেও দিল্লিতে সেগুলি একই নামে বিক্রি হয়।

আম্রপালি

অর্থকরী জাতের ভালোমন্দ দিক

ল্যাংড়া : ভারতের সবচাইতে জনপ্রিয় জাত, বিস্তৃত অঞ্চলে মানানসই, পরশাখীর বৈশিষ্ট্য প্রবল, ফলের উৎকর্ষতা অনন্য। কিন্তু ফল ধরার প্রাবল্যে ছোটোগাছে ফলন নেহাতই কম, প্রতি বছর ফলন পাওয়া যায় না, ফলের সংরক্ষণশীলতা স্বল্পমেয়াদি।

দশেরী : আমে ভিটামিন-সি'র মাত্রা উচ্চ, ফলের উৎকর্ষতা অনন্য, চতুর্থ বছর থেকেই অর্থকরী ফলন মেলে, ফলের সংরক্ষণশীলতা অধিক, ফল টিনে সংরক্ষণের উপযোগী, ফলন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কিন্তু এই জাতে বিটপীয় বিস্তারী অত্যধিক, ফলের গন্ধ অস্থায়ী, প্রতি বছর ফলন দেয় না, ফলের বাহ্যিক অবয়ব বিশেষ আকর্ষণীয় নয়, ম্যালফরমেশন বা গুচ্ছমুকুল রোগের প্রাবল্য অত্যধিক।

চৌসা : অত্যন্ত সুস্বাদু ফল, শেষ-মরশুমে বাজারে আসে, ফলের আকার ভালো, রং আকর্ষণীয়, ফলে রস যথেষ্ট। তবে ফলন কম, ছোটো অবস্থায় ফলনের আগাম পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয়, গাছের আকার ব্যাপক, প্রতি বছর ফলন দেয় না। গুচ্ছ মুকুল রোগের প্রাবল্য অত্যধিক।

বোম্বে গ্রিন : অর্থকরী জাতগুলির মধ্যে জলদি, স্বাদ ও গন্ধ অসাধারণ, ম্যাঙ্গো নেকটার তৈরির জন্য আদর্শ। তবে অঙ্গজ ও ফুলেল গুচ্ছমুকুল রোগে (Vegetative and floral malformation) সহজেই কাবু হয়। এক বছর অন্তর ফলনদায়ী, ফলের সংরক্ষণশীলতার মেয়াদ স্বল্প।

আলফানসো : বাজারের সবচাইতে জনপ্রিয় জাত, ফলের অসাধারণ সৌগন্ধ ফলের আকার-ওজন-বর্ণ যথার্থ। সংরক্ষণশীলতা অধিক, ফল ক্যানিয়ন করে সংরক্ষণ করার পক্ষে উত্তম, ফলের গন্ধ স্থায়ী। উৎকর্ষ ফল পাওয়ার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, শাঁসে স্পঞ্জি-টিস্যু (শারীরবৃত্তীয় সমস্যা) চোখে পড়ে, প্রতি বছর ফলন মেলে না।

নীলাম : নিয়মিত ফলনদায়ী, ফলন উচ্চ, উত্তর ভারতের জলবায়ুতে খর্বাকার, ফলন আগে আসে। কিন্তু ফলের মান অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

ব্যাঙ্গালোরা : মোটামুটিভাবে নিয়মিত ফলনদায়ী, উৎপাদন যথেষ্ট, দক্ষিণ ভারতের বাজারে জলদি আসে। তবে ফলের বাহিরানা খুব একটা আকর্ষণীয় নয়, ফলের মান নিকৃষ্ট, ব্যাক্টেরিয়া ঘটিত দাগ রোগে বেশ কাবু হয়।

ফজলি : বাজারে দেরিতে আসে, শাঁস বা খাদ্যোপযোগী অংশ বিপুল। কিন্তু অস্বাভাবিক বড়ো আকারের ফল, ফলের মান নিকৃষ্ট, এক বছর অন্তর ফলন দেয়।

বাঙ্গানপল্লী : দক্ষিণ ভারতের জলদি জাত, ফলের সংরক্ষণশীলতা ভালো, ক্যানিং (প্রক্রিয়াকরণ) করার উপযুক্ত, ফলন ভালো। এক বছর অন্তর ফলন দেয়, ফল কিছুটা চ্যাপ্টা আকারের।

পশ্চিমবঙ্গের জাত-বৈচিত্র্য

পশ্চিমবঙ্গে জলদি, মাঝারি ও নাবি—এই তিন প্রকারের আম পাওয়া যায়। কয়েকটি জাত অতি-নাবি, অর্থাৎ খুব দেরিতে পাকে, আশ্বিন মাসেও যা সহজলভ্য। রাজ্যে যে জাতগুলির আম জলদি পাকে, তার মধ্যে অন্যতম হলো বোম্বাই, গোলাপখাস আর গোপলভোগ। বোম্বাই জাতের দুটি প্রকার : সবুজ বোম্বাই আর হলুদ বোম্বাই। সবুজ বোম্বাই পাকলেও সবুজভাব রয়ে যায়। পক্ষান্তরে, হলুদ বোম্বাই পাকলে রং হয় আকর্ষণীয় সোনালি। ফলনের দিকটি ধরলে সবুজ-বোম্বাইকেই বেশি লাভজনক বলতে হবে। জলদি পাকে এমন আমের জাতগুলি সাধারণভাবে বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে পাকতে শুরু করে। বোম্বাই আম স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়। দক্ষিণবঙ্গে বিশেষত নদীয়া, ২৪ পরগনার আম চাষিদের কাছে তা বিশেষভাবে আদরণীয়।

মালদহের স্থানীয় বাজারে (অমৃতি, শোভানগর, খাসকোল প্রভৃতি) 'খোটালাগ্গা' জাতটিও জলদি পাকা আমের তালিকায় রয়েছে। মানিকচকের উপভাষায় 'খোটা' শব্দের অর্থ 'পিঁপড়ে'। পাকা আম এতটাই মিষ্টি আর সুস্বাদু যে তা কেটে রেকাবিতে রাখলে দ্রুত পিঁপড়ে ধরে যায়। খোটালাগ্গার মতো স্থানীয় কিছু লৌকিক কিংবা আঁটির জাত ভিন্ন জলদি জাত বৈশাখের শেষ সপ্তাহের আগে বাজারে চালান হলে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না, সেগুলি পূর্ণাবস্থার আগেই কার্বাইড দিয়ে কৃত্রিমভাবে পাকানো হয়েছে। অপুষ্ট আম আদৌ সুস্বাদু হয় না, এমনকী এই আম খেলে শরীরে নানা ক্ষতির সম্ভাবনা। গোপালভোগও মালদহের অত্যন্ত জনপ্রিয় জলদি জাত। এই ধরনের আম থেকে সেখানে উৎকৃষ্টমানের আমসত্ত্ব তৈরি হয়।

জ্যৈষ্ঠমাসের মাঝামাঝি সময় থেকে এ রাজ্যের সেরা জাতের আম হিসেবে বাজারে আসে হিমসাগর। মালদহের কোথাও কোথাও একে 'ক্ষীরসাপাতি' এবং মুর্শিদাবাদে 'সাদৌলা' নামে অভিহিত করা হয়। আমাদের রাজ্যে হিমসাগরের নানান উন্নত ক্লোন দেখতে পাওয়া যায়, ফলন ও উৎকর্ষতায় তা সমৃদ্ধতর; তা নিয়মিত ফলদায়ী, ফলের আকার মাঝারি। বড়ো মাপের তিনটি হিমসাগর আমের ওজন প্রায় এক কেজি। এমন আম থোকায় একটিই দেখা যায়, তবে কখনও কখনও তা দুটিও হতে পারে। হিমসাগরের কিছু ক্লোন ১০-১৫ দিন দেরিতে পাকে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ১৫ বছরের হিমসাগর আমগাছের উচ্চতা প্রায় ৮ মিটার হতে পারে এবং গোড়ার বেড় হবে প্রায় এক মিটার। আর গড় ফলন প্রায় ৯০ কেজি। গড়পড়তায় হিমসাগর আমের ওজন ২৪৫ গ্রাম, তাতে শাঁসের পরিমাণ প্রায় ৬৭ শতাংশ। শাঁসে দ্রবণীয় কঠিনের পরিমাণ ১৯.৩৫ ডিগ্রি ব্রিক্স, অম্লত্ব ০.৩১ শতাংশ। এই আম অত্যন্ত মিষ্ট স্বাদের, আকর্ষণীয় গন্ধযুক্ত, শাঁস মজবুত, আঁশবিহীন, সংরক্ষণশীলতা মাঝারি।

এ রাজ্যের অন্য একটি উচ্চমানের জাত হচ্ছে ল্যাংড়া। উত্তর ভারতেও এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও অর্থকরী জাত। কেউ কেউ এই আমকেই সেরা জাত বলে মনে করেন। সাধারণত যে শিরোপা পেয়ে থাকে আলফানসো। এই আমের একটি বিশেষ গন্ধ আছে। এটি মাঝ-মরশুমি বা মাঝারি-জলদি জাতের আম, হিমসাগরের পর বাজারে আসে। গড়ে সাড়ে তিনটে থেকে চারটি আম নিয়ে এক কেজি। তবে এই জাতটিতে দু'বছর অন্তর ফল আসে। এই ফলের গুণমান ভালো, শাঁস বেশ মজবুত, লেবুর মতো হলদেটে রং। শাঁসে খুব কম সময়েই আঁশ লক্ষ্য করা যায়। ল্যাংড়ার সংরক্ষণশীলতা মাঝারি। ১৫ বছরের ল্যাংড়ার উচ্চতা প্রায় সাড়ে সাত মিটার, গাছের বেড় প্রায় ১২০ সেন্টিমিটার, ফলন ৮০ কেজি। ফলের ওজন ২৪০ গ্রাম, শাঁসের পরিমাণ ৭৪ শতাংশ, ফলের অম্লত্ব ০.২৭ শতাংশ।

মরশুমের শেষ আম বলতে রাজ্যবাসী সাধারণত ফজলি আমকেই বোঝে, যদিও

মল্লিকা

সংকরজাত আম্রপালি

মালদহে আশ্বিনা নামে একটি জনপ্রিয় আম আছে যা আচার শিল্পে ব্যবহৃত হলেও পাকা আম বাজারে আসে। শেষ মরশুমের বাজার ধরবার জন্য মালদার আমচাষিরা ফজলি ও আশ্বিনা লাগান। ফজলি আমের চেহারা রাজকীয়, আকারে বড়ো। এটি বিহারের আদি দেশি জাত, ফল পাকে দেরিতে, জুলাই মাসের শেষ থেকে আগস্টে। এক একটি ফজলি আমের ওজন এক কেজি হওয়া অসম্ভব নয়। পাকা অবস্থাতেও এই আমের খোসার রং সবুজ, বোঁটার দিকের কিছুটা অংশে কালচে ভাব থাকে। ফজলির শাঁস ঠাসা থেকে নরম হতে পারে। এর গন্ধ আনন্দদায়ক, শাঁস মিষ্টি এবং আঁশবিহীন, ফলের সংরক্ষণশীলতা ভালো। ১৫ বছরের আমগাছের উচ্চতা প্রায় ৯ মিটার হতে পারে, গাছের গোড়ার দিকের বেড় ১২৫ সেন্টিমিটার, ফলন প্রায় ৭০ কেজি। ফলের ওজন গড়ে ৫২৫ গ্রাম, শাঁসের পরিমাণ প্রায় ছিয়াত্তর শতাংশ, ফলের অম্লত্ব ০.৩৭ শতাংশ।

ইদানীং এ রাজ্যে বেঁটে বা মাঝারি সংকর জাত আম্রপালি এবং মাঝারি বিপুলায়তনের সংকর মল্লিকা যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে। আম্রপালি নিয়মিত ও ভালো ফলনদায়ী জাত। জুনের শেষে বা জুলাইয়ের প্রথমে বাজারে আসে। ফলের রং সবুজ থেকে এপ্রিকট হলুদ, মাঝারি আকারের ফল, মিষ্টি স্বাদ, আঁশবিহীন, গায়ে কমলা শাঁস। শাঁসের পরিমাণ ফলের ওজনের ৭৫ শতাংশ। মল্লিকা সংকর জাতটির ফলন মাঝারি, নিয়মিত ফলনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মল্লিকার ফল এপ্রিকট হলুদ, ওজন ৩০০ গ্রামের অধিক, ফলে শাঁসের ভাগ প্রায় ৭৪ শতাংশ। শাঁসে আঁশ নেই, ফলের সংরক্ষণ ক্ষমতা অতি উচ্চ, প্রায় ১০ থেকে ১১ দিন।

ভারতের কয়েকটি সংকর আমের জাত

১. প্রভাশঙ্কর (বোম্বাই × কালাপাডি) : বিহার এগ্রিকালচার কলেজ, সাবুর থেকে এই জাতটি উদ্ভাবিত হয়েছে। এটিই ভারতে উদ্ভাবিত প্রথম সংকর জাত। জাতটি মাঝারি নাবি থেকে নাবি, প্রতি বছর ফলনদায়ী। পাকা ফল ফিকে সবুজ, শাঁস খুব মিষ্টি, আনন্দদায়ক সৌগন্ধ, আঁশবিহীন, নরম, কমলালেবুর মতো রং, ফলের ওজন মাঝারি, ২০০ গ্রাম, লম্বায় ৯.২ সেন্টিমিটার, চওড়ায় ৬.৯ সেন্টিমিটার, অম্লত্ব ০.৩৪ শতাংশ, শাঁস ৬৪ শতাংশ। এই জাতটি উচ্চগতির বাতাস সহনশীল এবং প্রতিকূল পরিবেশে ভালো ফলন দেয়, হেক্টরে ফলন ২৩৫ কুইন্টাল।

২. মামুদবাহার (বোম্বাই × কালাপাডি) : বিহার এগ্রিকালচার কলেজ, সাবুর থেকে এই সংকর জাতটিও উদ্ভাবিত হয়েছে। এই সংকর জাতের পিতা-মাতা প্রভাশঙ্করের মতো এক হলেও ফলে বৈশিষ্ট্য আলাদা। এটিও নাবি জাত এবং মোটামুটি নিয়মিত ফলনদায়ী। পাকা ফলের রং ফিকে সবুজ। ফলের ওজন মাঝারি, ২১০ গ্রাম, লম্বায় ৮.৮ সেন্টিমিটার, চওড়ায় ৭.১ সেন্টিমিটার। শাঁস হলুদ রঙের, মিষ্টি স্বাদ, আনন্দদায়ক সৌগন্ধ, কম আঁশযুক্ত এবং শাঁস দৃঢ়। শাঁসের এই দৃঢ়তার জন্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বিশেষ চাহিদা হতে পারে। অম্লত্ব ০.২৫ শতাংশ, শাঁসের পরিমাণ ৭০.৯ শতাংশ গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ২৩০ কুইন্টাল।

৩. আম্রপালি (দশেরী × নীলম) : ১৯৭৯ সালে নিউদিল্লির ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠিত (আইএআরআই) কর্তৃক উন্মুক্ত হয়। গাছ ছোটো, বেঁটে, মাঝারি প্রসারিত, উচ্চ ঘনত্বে (২.৫ × ২.৫ মিটার, হেক্টরে ১৬০০ গাছ) রোপণের উপযুক্ত (পলন পাবার পর জুলাই- আগস্টে বার্ষিক ডালপাতা ছাঁটাই সাপেক্ষে), নিয়মিত ফলনদায়ী, উচ্চ ফলনশীল। পাতা ডিম্ব-ভল্লাকার, মাঝারি গোটানো, পত্র-কিনারা কিছুটা তরঙ্গায়িত বিশেষত পত্রফলকের মাঝখান থেকে কিনারা পর্যন্ত পূর্ণবয়স্ক পাতা গাঢ় সবুজ। ফল ছোটো থেকে মাঝারি, ১৬০ থেকে ১৮০ গ্রাম ওজন, কখনও তার কিছু বেশি, ফল পাকে মরশুমে একটু দেরি করে। ফল ডিম্ব-আয়তাকার, খোসা মোটা, রং হালকা সবুজাত- এপ্রিকট হলুদ। শাঁস আঁশবিহীন, গাঢ় কমলা, ফলের ৭৫ শতাংশ শাঁস। ফল অসাধারণ সুস্বাদু, উৎকৃষ্টমানের, অম্লত্ব ০.১৫ শতাংশ, ভিটামিন-সি প্রতি ১০০ গ্রাম শাঁসে ৩৫ মিলিগ্রাম, ফলে ভিটামিন-এ ভালোমাত্রায় পাওয়া যায়, ১০০ গ্রাম শাঁসে ১৬.৮৩ মাইক্রো গ্রাম ক্যারোটিনয়েড থাকে। আকর্ষণীয় রঙের জন্য এই ফলের শাঁসকে অন্য আমের তৈরি প্রক্রিয়াকৃত ফলে রং হিসেবে ব্যবহার করা চলে। এই আম টেবিলে কেটেও পরিবেশন করা যায়, তৈরি হয় নেকটার। ভারতের প্রায় সর্বত্র এই আমের সাফল্য ভালো।

৪. মল্লিকা (নীলাম × দশেরী) : এই সংকর জাতটিও নিউদিল্লির ভারতীয় কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভূত হয়ে ১৯৭১ সালে উন্মুক্ত হয়েছে। গাছ মাঝারি বলিষ্ঠ, উচ্চ ফলদায়ী, ফল আকর্ষণীয় এবং প্রতি বছর ফল ধরার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পরিপূর্ণ পাকা ফলের রং এপ্রিকট হলুদ। এটি মাঝারি থেকে বৃহৎ ফল দেয়, ওজনে ৩০০ থেকে ৫০০ গ্রাম। এর শাঁসের প্রমাণ ৭৫ শতাংশ, শাঁস আঁশবিহীন এবং ঠাসা, সুস্বাদু এবং সুগন্ধে ভরপুর। মোট দ্রবণীয় কঠিনের মাত্রা উচ্চ, ফলের সংরক্ষণশীলতাও উচ্চ (প্রায় ১২ দিন)। এই ফল ডেসার্ট (খাবার পর) এবং প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ব্যবহারের উপযোগী। সারা ভারতে আম উৎপাদনে এই জাতটি ভালো ফল দিয়েছে। বর্তমানে দক্ষিণ ভারতে এই সংকর অর্থকরী চাষের জন্য খ্যাতি লাভ করেছে।

আমের অন্যান্য সংকর জাতগুলি হচ্ছে কোঙ্কণ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভাভিত রত্না (নীলম × আলফানসো) এবং সিন্ধু (রত্না × আম্রপালি); পুসা শ্রেষ্ঠ (আম্রপালি × সেনসেশন); পুসা অরুণিমা (আম্রপালি × সেনসেশান); চমৎকার হলুদ রঙের পুসা পীতাম্বর (আম্রপালি × লাল সুন্দরী), উজ্জ্বল লাল রঙের ও কমলা শাঁসের পুসা লালিমা (দশেরী × সেনসেশান)। এই সংকর জাতগুলির প্রতিটিই নিয়মিত ফলনদায়ী।

একটা বাংলা প্রবাদ হলো, 'ফুরোলো বাগানের আম/কী খাবি রে হনুমান।' অর্থাৎ আমের মরশুম বন্য প্রাণীর জন্যও সুখকর, তাদের উদরপূর্তির সহায়ক। আমের মরশুম শেষ তো, তাদেরও ভালো খাবার বাড়ন্ত। হনুমান কেবল নয়, অসংখ্য পাখি আমের লোভে ছুটে আসে। বলা হয়, আম পেকেছে কিনা, প্রথম সন্ধান পায় কাক। পাখিতে/হমুমানে খাওয়া আম পড়ে থাকে গাছের তলায়। ধেয়ে আসে মৌমাছির দল, মাছি, আরও কত রকমের কীটপতঙ্গ। ফুলের মধু-মকরন্দ-পরাগের বদলে পাকা আমের রসের সন্ধানে মেতেছে অলিকুল। এমনই নানান আমের বৈচিত্র্যকে সঙ্গে নিয়ে আসে জামাইষষ্ঠী। □

অন্তর্রাষ্ট্রীয় মিলেট বর্ষের

ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর লহরীবাঈ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মধ্যপ্রদেশের বৈগা জনজাতির মহিলা লহরীবাঈকে যখন আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ঘোষণা করা হলো তখন দেশের বহু মানুষ তাঁর নামই জানতেন না। প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন কী বাতে লহরীবাঈয়ের নাম উল্লেখ করে প্রশংসা করার পর মানুষ তার সম্পর্কে গুগলে সন্ধান করতে শুরু করেন। তারপর বিভিন্ন মিডিয়ায় তার তার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আসতে শুরু করল তখন মানুষ জানতে পারল যে, লহরীবাঈ একজন জনজাতি মহিলা যিনি গত ১০ বছর ধরে পরম্পরাগত কিন্তু লুপ্ত হয়ে যাওয়া ১৫০ রকমের ফসলের বীজ সংগ্রহ করে একটি বীজ ব্যাংক তৈরি করেছেন।

লহরীবাঈ ছোটোবেলার তার ঠাকুমার কাছে পরম্পরাগত পুষ্টিকর খাদ্যশস্যের নাম শুনেছিলেন। আঠারো বছর বয়স থেকে তিনি বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজে লেগে পড়েন। মধ্যপ্রদেশের ডিন্ডোরি জেলার সিলপাড়ী তহসিলের এক প্রত্যন্ত গ্রামের লহরীবাঈ বনেজঙ্গলে এবং আশেপাশের গ্রামের খেত থেকে বীজ সংগ্রহ করা শুরু করেন। তার মাটির ঘরে মাটির পাত্র বানিয়ে থরে থরে বীজগুলি সাজিয়ে রাখেন। মাঝে মাঝে সেগুলি রোদে শুকিয়ে আবার তুলে রাখেন। নিজেরা কিছু কিছু চাষ করেন, নিজের গ্রাম ও আশেপাশের গ্রামের লোককেও চাষ করার জন্য কিছু কিছু দেন। বিনিময়ে সবাই তাকে কিছু উপহার স্বরূপ ফসল দেন।

লহরীবাঈ বলেন, 'হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন ফসলের বীজ খুঁজে খুঁজে বের করে, তা সংরক্ষণ করার মধ্যে আমি আনন্দ পাই। গত ১০ বছর ধরে আমি এই কাজ করে চলেছি। আমি যেখানেই যাই, পরম্পরাগত ফসলের বীজের খোঁজ করি এবং সেগুলি বাড়িতে নিয়ে এসে যত্ন করে রেখে দিই। প্রথম যখন এসব করতে শুরু করলাম, গ্রামের লোকেরা উপহাস করত। তারা ভাবত আমি ফালতু কাজে সময় নষ্ট করছি। কিন্তু আমি কারও কথায় কান না দিয়ে নিজের লক্ষ্যে স্থির থেকেছি। আমি মনে মনে দুটি বিষয় ঠিক করেছিলাম। এক, আমি বিয়ে না করে সারা জীবন মা-বাবার সেবা করব আর দুই, হারিয়ে যাওয়া ফসলের বীজ সংগ্রহ করে গ্রামের লোককে দিয়ে চাষ করিয়ে তার পুনরুদ্ধার করবো। এখন ১৬ রকম বীজ আর খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। তবু আমি ১৫০ প্রকারের বীজ সংগ্রহ করে বীজব্যাংক তৈরি করেছি। এগুলির পুষ্টিগুণ অনেক বেশি। এখন আমি খুশি যে একদিন যারা আমাকে উপহাস করেছিলেন, তারাও এখন আমাকে সহযোগিতা করছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, প্রধানমন্ত্রী তাঁর টুইটে লিখেছেন, লহরীবাঈয়ের জন্য তিনি গর্বিত। লহরীবাঈ শ্রীঅন্ন অর্থাৎ জোয়ার, বাজরা, রাগি, সামা, কঙ্গনি, চীনা, কোড়ন,কাটকি ও কুট্টুবীজ সংরক্ষণ করে বিরাট বড়ো কাজ করেছেন। তাঁর প্রয়াস বহু মানুষকে পরম্পরাগত চাষে অনুপ্রাণিত করেছে।

মূলত, বহু শতাব্দী ধরেই এই জাতীয় খাদ্যশস্যগুলি ভারতবাসীর জীবনধারণের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে কেন্দ্রীয় কৃষিদপ্তর এবছরকে অন্তর্রাষ্ট্রীয় মিলেট বর্ষ ঘোষণা করে। কিন্তু বেশ কয়েক বছর আগেই পুষ্টিকর শস্য উৎপাদনের জন্য এই ধরনের চাষ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়, মধ্যপ্রদেশের প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়ে লহরীবাঈয়ের ঘরে ১৫০ রকমের বীজ সংরক্ষিত আছে। সেই বীজ থেকে আবার নতুনভাবে চাষ শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ তাকে 'বীজ সংগ্রাহক' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সবচাইতে বড়ো কথা হলো, পুঁথিগত বিদ্যা না থাকলেও কৃষি গবেষণারত শিক্ষার্থীদের কাছে লহরীবাঈ শিক্ষিকার মর্যাদা লাভ করতে চলেছেন। □

পিজিয়ান হোল প্রিন্সিপাল

সেদিন এক রবিবারের দুপুর ছিল। অধীর আর আনন্দ অময়ে জ্যাঠার বাড়িতে পুবের ঘরটিতে বসে মনের আনন্দে খোশগল্প করছিল। অময়ে জ্যাঠা হাতের মোটা বইটি সামনের টেবিলে রেখে, চেয়ার থেকে সবেগে উঠে ঘরে টাঙ্গানো গ্রান্ডফাদার্স ক্লকের উপরে একবার দৃষ্টিপাত করে দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে রাখা চালের কৌটা থেকে খানিক চাল বার করলেন, তারপর বাইরে জানালার কার্নিশে তা ছড়িয়ে দিয়ে জানালা বন্ধ করে দিলেন। এতকিছু আনন্দের চোখে ধরা পড়েনি। সে গতকালের বিয়েবাড়ির ভোজের গল্প করতেই ব্যস্ত। কতজন এসেছিল, কী কী খাওয়া হলো ইত্যাদি ইত্যাদি।

জ্যাঠার কাণ্ডকারখানা কিন্তু অধীরের চোখ এড়ায়নি। ও কৌতুকের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল— ওটা কী হলো জ্যাঠা?

—ও আমার অতিথিদের জন্য। জ্যাঠা হেসে বললেন।

অধীর কিছু বলার আগেই জ্যাঠা প্রশ্ন করে বসলেন, আচ্ছা আনন্দ, বিয়েবাড়িতে কতজন লোক এসেছিল, বলতে পারবে?

—অনেক, প্রায় আড়াইশো। আনন্দ ভুরু উঁচিয়ে বলল।

—তা বেশ। কিন্তু এটা কি লক্ষ্য করেছিলে যে বিয়েবাড়িতে এমন দুজন লোক ছিল যারা সমান সংখ্যক লোক চেনে? জ্যাঠা বললেন।

অধীর আর আনন্দ দুজনেই না বুঝতে পারলে জ্যাঠা গুছিয়ে সহজ করে বললেন, ধরো, এক সভায় ৫০ জন লোক উপস্থিত, সেখানে একটি লোকের আরেকটি লোককে চেনা বা না চেনার সমান সম্ভাবনা। তাহলে সেই সভায় অন্তত এমন দুজন থাকবে যারা সমান সংখ্যক লোককে চেনে। বলতে পারো কী করে?

দুজনেই ঘাড় নেড়ে অপারগতা প্রকাশ করলে জ্যাঠা বললেন, তবে একটা ছোটো গল্প বলি শোনো। একটু সুবিধা হতে পারে। ধরো, তোমাদের কাছে ৫টি খাঁচা আর ৬টি পাখি আছে। পাখিগুলি খাঁচায় রাখতে হবে। তাহলে অন্তত একটি খাঁচাতে ২টি পাখি রাখতে হবে।

অধীর বলল, এই ছোটো গল্পটা দিয়ে এই প্রশ্নের সমাধান কী করে হতে পারে?

জ্যাঠা বললেন, আমি তাহলে উত্তরটা বলেই দিই। ধরো, সেখানে এমন কেউ নেই যে সবাইকে চেনে। তাহলে একজন সর্বনিম্ন ০ জনকে চিনতে পারে এবং একজন সর্বোচ্চ ৪৮ জনকে। লক্ষ্য করো যে, ০ থেকে ৪৮ মোট ৪৯ খানা সংখ্যা আর যেখানে লোকসংখ্যাই ৫০, তাহলে আমাদের এই ছোটো গল্প থেকে বুঝতেই পারছ যে এমন অন্তত ২ জন থাকবে যারা সমান সংখ্যক লোককে চেনে।

আমরা আমাদের সমাধানে সর্বপ্রথম যা ধরেছিলাম তা যদি না হয়, তাহলে একজন সর্বোচ্চ ৪৯ জনকে চিনতে পারে এবং সর্বনিম্ন ১ জনকে চিনতে পারে। এই ছোটো গল্পের সাহায্যে আশা করি তোমরা এর সমাধান করে ফেলেছ।

কথাটা শেষ করেই অময়ে জ্যাঠা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে জানালাটা আলতো করে খুলে দেন। সূর্যের সোনালি আভা অধীর ও আনন্দের মুখের ওপর পড়ে ওদের মুখমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করে তোলে। অময়ে জ্যাঠা বলে ওঠেন, অঙ্কের ভাষায় এই ছোটো গল্পটিকে বলে 'পিজিয়ান হোল প্রিন্সিপাল'। তখনই অধীরের খেয়াল হলো জানালার কার্নিশে চালের দানা কণামাত্রও অবশিষ্ট নেই।

মৌনব দাস
সাউথ পয়েন্ট হাই স্কুল,
দ্বাদশ শ্রেণী।

বীর বনবাসী

উ তিরোত সিং সিয়েম

খাসি জনজাতি যোদ্ধা উ তিরোত সিয়েমের জন্ম ১৮০২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুলাই মেঘালয়ের মৈরাং-এ। তিনি খাসি রাজ্যের রাজা ছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাস্তা তৈরির নামে তাদের রাজ্য দখল করলে তিনি খাসি জনজাতি যোদ্ধাদের নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। মিজোরামকে কেন্দ্র করে তিনি চার বছর ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইংরেজ সেনার হাতে বন্দি হন এবং ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গের ঢাকার তাঁর মৃত্যু হয়।

জানো কি?

- মানুষের ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রায় ৫০ হাজার গন্ধ আলাদাভাবে শনাক্ত করতে পারে।
- ভারতের মহিলারা যে পরিমাণ সোনা গহনা হিসেবে ব্যহার করেন তা আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি ও বিশ্বব্যাংককে গচ্ছিত সোনার চাইতে বেশি।
- প্রেসক্রিপসনে ডাক্তারের হাতের লেখা না বুঝতে পারার কারণে ভুল ওষুধ খেয়ে বিশ্বে প্রতি বছর সাত হাজার রোগী মারা যায়।
- স্কুলবাস হলুদ রঙের হওয়ার কারণ হলো অন্য রঙের চেয়ে হলুদ রং ১.২৪ গুণ দ্রুত চোখে পড়ে।

ভালো কথা

কাকের বাসা

আমাদের বাসার পিছনে বড়ো আমগাছটার উঁচু একটা ডালে এক কাক দম্পতি কয়েকদিন থেকে বাসা বাঁধার জন্য দড়ি, তারের টুকরো নিয়ে গিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল। আর রাখামাত্রই সেগুলো নীচে পড়ে যাচ্ছিল। গতকাল আমাদের পাশের বাসার শ্যামল ওই গাছে উঠে বেশ খানিকটা ঝোপঝাড় ওখানটায় ভালো করে রেখে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে নীচে নামতেই কাকদুটো এখানটায় গিয়ে বেশ করে দেখে নিয়ে মনের আনন্দে বাসা তৈরি করতে লেগে পড়েছে। এখন আর ওদের কোনো জিনিস নীচে পড়ে যাচ্ছে না। মনে হয় ওরা খুব খুশি।

শ্যামলী রায়, দ্বাদশ শ্রেণী, ফারাক্কা ব্যারেজ কলোনি, মুর্শিদাবাদ।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

ধন্য আমি

শ্রেয়া ঘোষ, নবম শ্রেণী, কমলপুর, বাঁকুড়া।

দুপুরবেলা প্রখর রোদে
দলে দলে আসে পাখি,
আমি ওদের কষ্ট দেখে
জলভরা পাত্র ছাদে রাখি।
পাখিরা সবপ্রাণ ভরিয়ে
পান করে সেই জল
তাই না দেখে দুচোখ ভরে
টপটপিয়ে পড়ে যে জল।

ঠাকমা বলে মনটা তোমার
ফুলের মতো নরম,
মা বলে এটাই তো চাই
একেই বলে ধরম।
বাবা বলে লক্ষ্মীটি আমার
খুবই নরম মনটি তোমার
এমনি মন খুবই দামি,
তখন ভাবি, ধন্য আমি।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

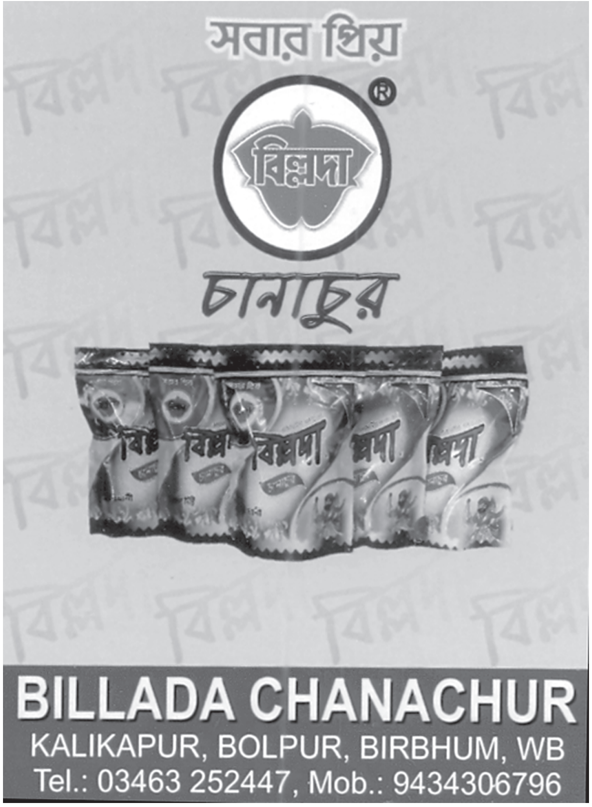

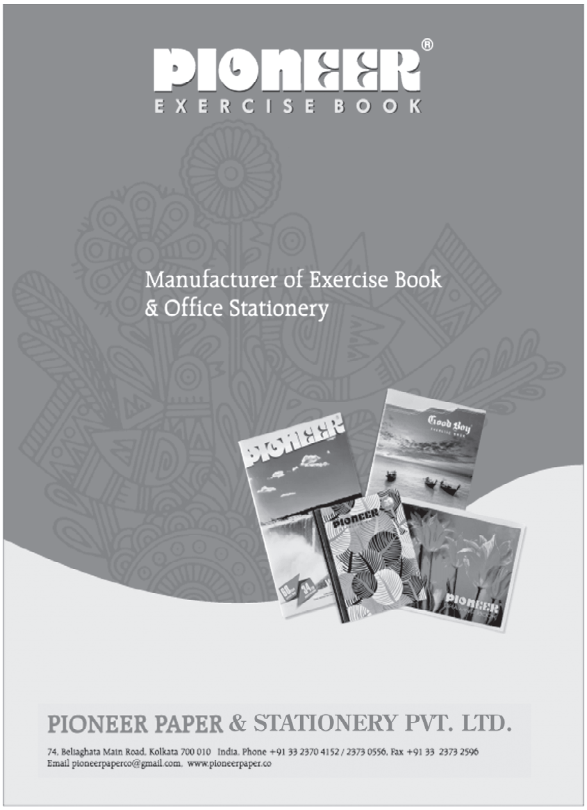

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব
কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার উৎস

ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত

ড. জয়ন্ত কুশারী

কাজী নজরুল ইসলামের ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় বিদ্রোহ চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মূলত ঋগ্বেদের ‘দেবীসূক্ত’ থেকে শক্তি সঞ্চয় করে নজরুল এখানে প্রবল বিদ্রোহ বাণী উচ্চারণ করেছেন। এছাড়াও ভারতীয় এবং পশ্চিম এশীয় পুরাণ ও ইতিহাস প্রভাবিত করেছে বিদ্রোহী কবিতাটিকে। আমরা সে কথায় আসব। এখন দেখে নেওয়া যাক কবিতার বিষয় ভাবনার বাস্তব ভাবটিকে। নজরুল বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে। শৃঙ্খলাবদ্ধ আমিত্বর বিরুদ্ধে। এখানে নজরুল তাঁর বিদ্রোহকে সঙ্গতকারণেই ‘আমি’ প্রতীকে ব্যঞ্জনা করেছেন এবং নিজেকে অজেয় বলে উপস্থাপিত করেছেন তাই তো বিদ্রোহী আত্মশক্তিকে উদ্বোধিত করার লক্ষ্যে প্রথমেই কবির সরব ঘোষণা ‘বল বীর চির উন্নত মন শির...।’ কবি এই কবিতার প্রথম স্তবকেই প্রসঙ্গত উত্থাপন করেছেন,। মহাবিশ্ব, মহাকাশ, চন্দ্রসূর্য, গ্রহতারা, ভূলোক, দ্যুলোক, গোলোক, খোদার আসন, বিশ্ববিধাত্রী, চিরবিস্ময়, রাজটীকা, রুদ্র ভগবান আর দীপ্ত জয়শ্রীর কথা।

বক্তব্যের অনুক্রম অনুযায়ী কবিতাটিকে মোট দশটি স্তবকে ভাগ করা যায়। প্রথম স্তবকে ‘আমি’-র শক্তিমত্তার পাশাপাশি রয়েছে বিজয়ের প্রত্যয়। আর বিজয়ের জন্য প্রয়োজন আঘাতকারীর। ‘আমি’-র ধ্বংসাত্মক রূপ যা কবিতাটির ১১ থেকে ২৭ পঙ্‌ক্তি পর্যন্ত ঘূর্ণিত ‘আমি’। ঝঞ্ঝা ‘আমি’। ‘আমি’ ঘূর্ণি। আমি পথ সম্মুখে যাহা পাই, করি যাই চূর্ণি।’ শক্তির উদ্বোধন ও সংহার চিত্রের পরই হঠাৎ শুরু হলো মিলনের নৃত্যপাগল ছন্দ। ২৮ থেকে ৩৭ পর্যন্ত ‘আমি’ এমন এক মুক্ত জীবনানন্দ যে শত্রুর সঙ্গে গলাগলি করে আবার মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে। কিন্তু মিলনের এই আকাঙ্ক্ষার পর পরবর্তী দুই পঙ্‌ক্তিতে ‘আমি’ আবার মহামারী, ভীত, শাসন-ত্রাসন ও সংহার রূপে আবির্ভূত।

তারপর ৪২ থেকে ৫১ সংখ্যক পঙ্‌ক্তিতে আবার আছে উদ্যম, ইতিবাচকতা, হোমশিখা, উপাসনা, নিশাবসানের আকঙ্ক্ষা। আর এই অংশের ৪৯তম পঙ্‌ক্তিতেই সেই জাদুকরি সকল স্বীকারোক্তি— ‘মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য।’

এই কবিতার ছত্রে ছত্রে বৈদিক পৌরাণিক রূপকের ব্যবহার এতটাই যথার্থ যে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। রূপকের প্রয়োগ দেখে যে কেউ অনুমান করতে পারবেন বেদ ও পুরাণের ওপর কবির কতটা দখল ছিল। এই কবিতায় যেসব ঐতিহ্য এবং বেদ ও পুরাণের শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে, তা পর্যায়ক্রমে এখন ব্যাখ্যা করছি। যেমন, ভূলোক অর্থাৎ পৃথিবী। দ্যুলোক অর্থাৎ স্বর্গ। আর গোলোক অর্থাৎ বিষ্ণুলোক। অথবা স্বর্গে বিষ্ণু বা কৃষ্ণের বাসস্থান। রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবন এখানেই অবস্থিত। ঋগ্বেদের রুদ্র বজ্রের দেবতা। গ্রিক মিথের ‘থর’র ক্ষেপে গেলে বজ্র ছুঁড়ে মারেন। মহাপ্রলয়ের সময়ে মহাদেব তাণ্ডব নৃত্যকলার উদ্ভাবক হিসেবে তাঁকে ‘নটরাজ’ বলা হয়। পৃথু পৃথিবীকে বশ করেন। তাঁর রাজত্বকেও বলা হয় পৃথু। চেঙ্গিস খান ছিল মঙ্গোলিয়ান। এবং দুর্ধর্ষ সমর নায়ক। যুবক চেঙ্গিস স্ত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে যায় আর এক গোষ্ঠীপ্রধান। চেঙ্গিস খান তাঁর নিজ গোষ্ঠীকে পুনর্গঠিত করে অপহরণকারী গোষ্ঠীকে নৃশংসভাবে পরাস্ত করে স্ত্রীকে উদ্ধার করে। এরপর অন্যান্য মঙ্গোল গোষ্ঠীগুলিকে একীভূত করে অর্ধেক বিশ্ব জয় করেন। ইসলাম মতে কেয়ামত বা মহাপ্রলয় শুরুর আগে হজরত ইসরাফিল নামক ফেরেস্তা শিঙায় ফুঁ দেবেন।

সমাজের অসাম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সত্তা কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিচিত্তে বিদ্রোহী চেতনার প্রকাশ পেয়েছে। তিনি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ঘুমন্ত দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার জন্য নিজে যেমন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, তেমনই জাতিকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াসী হয়েছেন। কবি জরাজীর্ণ পুরাতন সমাজ ও রীতিনীতি ভেঙে নতুন দেশ ও জাতি গড়তে তাঁর কাব্যে ভাঙনের খেলা খেলেছেন। কবি পরাধীনতার বিরুদ্ধে, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। সমকালীন যুগ, তার রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত, সংশয়, দ্বিধা, অনিশ্চয়তা, অবক্ষয় উপনিবেশবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। বিদ্রোহী কবিতায় দেখা যায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দ্বারা পদদলিত এদেশ দীর্ঘকাল শাসন শোষণ, অন্যায় অবিচার আর বৈষম্যের পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন থেকেছে। সমাজ সচেতন কবি এ সমাজ ও দেশের অবিচার ও বৈষ্যমের বিরুদ্ধে বিপ্লবী মনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁর কবিতায়। কবির এই বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ উচ্চকিত থাকবে যতদিন না তার মূল উৎপাটিত হয়।

বর্তমান সময়ে নানারকম অসাম্যের ভিড়ে আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করি বিদ্রোহী কবিতার প্রাসঙ্গিকতা ও তার অম্লান তাৎপর্যের কথা। উপনিবেশবাদের অবসান ঘটলেও বিশ্বায়নের শৃঙ্খল আর ধনতন্ত্রের শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার, নির্যাতন-সহ আর্থ-সামাজিক বৈষম্য সবকিছুই বলবৎ আছে। অত্যাচারীর

ফ : ৬

খড়্গ কৃপাণের তলে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল এই বিশ্বের আকাশে বাতাসে আজও প্রতিনিয়ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। অন্যদিকে মানুষের শক্তির প্রতি, তার বীরত্বের প্রতি অনাস্থাও সমানভাবে অটুট। তাই নজরুলের ভাষায় শান্ত থাকার অবকাশ মিলছে। চারদিকের প্রতিবাদহীন মেরুদণ্ডহীনতার পরিপ্রেক্ষিতে বিপুল ভাবে কাম্য হয়ে উঠেছে 'উন্নত মম শির'-এর বজ্রদীপ্ত ঘোষণা। শোষণ, পীড়ন ও বৈষম্য থেকে মুক্তির সংকল্প নিয়ে, মানুষের আপন শক্তির উদ্বোধন ঘটিয়ে নজরুল কথিত বিদ্রোহের রথে আসীন হওয়ার যেন কোনও বিকল্প নেই।

কবি 'বিদ্রোহী' কবিতায় যে বিদ্রোহ উপস্থিত করেছেন এবং 'আমি' বলে যে শক্তিকে মূর্ত করে তুলেছেন তার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিরোধী ব্যাখ্যাই কবিতাটি সম্পর্কে এই মিশ্র প্রতিক্রিয়ার কারণ। সুতরাং প্রথমেই কবি 'আমি' বলতে কী বলতে চেয়েছেন তা বোঝবার চেষ্টা করা দরকার।

'আমি' বলতে প্রাথমিকভাবে কবি নিশ্চয়ই তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ই তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু এই পরিচয়কে কবির প্রাত্যহিক জীবনের ধূলিমলিন পরিচয় ভাবলে অবিচার করা হবে। প্রত্যেক আত্মসচেতন ব্যক্তির মধ্যে দুটি সত্তা— একটি তাঁর প্রতিদিনের পরিচয় বহন করে। আর একটি তাঁর বিরাটত্বের পরিচয়বাহী। প্রাত্যহিক সত্তায় থাকে অহংকার। বৃহত্তম সত্তায় থাকে অহংবোধ। রবীন্দ্রনাথ এই দুটি সত্তাকে বোঝাতে চেয়েছেন 'ক্ষুদ্র আমি' আর 'বিরাট আমি' বলে। দর্শনের ভাষায় বলা যায়, এই বিরাট মানুষের এক ধরনের 'ক্রজ' বা 'আত্মব্যক্তিত্ব'। এই অহংবোধ মানুষের মধ্যে অকস্মাৎ জাগ্রত হয়ে থাকে। এক বিরাট মানসিক শক্তিদান করে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও একদিন এই শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'প্রভাত সংগীত'-এর কবিতাগুলি রচনা করেন। কাজী নজরুল ইসলাম মনের মধ্যে সেই শক্তির প্রেরণাতেই উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এবং নিজের সেই বৃহত্তর সত্তাকে প্রকাশ করেছেন 'আমি' হিসেবে।

কিন্তু 'আমি' বলতে শুধুই ব্যক্তিগত ভাবে কবিকে মনে করা ঠিক হবে না। এ 'আমি' কোনো বিশেষ 'আমি' নয়, এর পরিচয় আরও বিস্তৃত। কবি এখানে নতুন যুগের মানুষের চিত্ত জাগরণের অগ্রদূত। তিনি শুধু নিজের মুক্তিই অনুভব করেননি। তাঁর মনে-প্রাণে জেগেছে নিপীড়িত মানুষদের মুক্তির স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ কারার নেশা। কবি কেবল নিজে স্বাধীন, একথা উচ্চারণ করেননি। তিনি সদাজাগ্রত মানুষের অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে তাদেরও জাগরণের মন্ত্র পাঠ করিয়েছেন। ঋক্ বৈদিক যুগে ঋষি অম্ভৃণ কন্যা বাক্‌দেবীও মানুষের আত্মোপলব্ধির আর চিত্ত জাগরণের এই মন্ত্রই পাঠ করিয়েছিলেন। আর একই সঙ্গে আত্মপরিচয়ও ঘোষণা করেছিলেন ঋক্ মন্ত্রে, যা 'দেবীসূক্ত' নামে বিখ্যাত। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, 'দেবীসূক্ত'-র নির্যাসই কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্যে নিহিত আছে। অন্যভাবে বলা যায়, 'বিদ্রোহী' কবিতার উৎস হলো 'দেবীসূক্ত'। এখন শুনে নেওয়া যাক্, ঋষি অম্ভৃণ কন্যা বাক্ 'দেবীসূক্ত'-এ ঠিক কী বলছেন— 'আমি' একাদশ রুদ্র, 'আমি' অষ্ট বসু, 'আমি' দ্বাদশ আদিত্য এবং 'আমি' বিশ্ব— দেবতারূপে বিচরণ করি।

'আমি' মিত্র ও বরুণ উভয়কে ধারণ করি। 'আমি' ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি। 'আমি' দেবশত্রুহন্তা সোমদেবকে, ত্বষ্টা নামক দেবতাকে এবং পূষা ও ভগ নামক সূর্যদ্বয়কে ধারণ করি। উত্তম হবিঃ (দেবতার উদ্দেশে হোমাগ্নিতে যা আহুতি রূপে দেওয়া হয়) যুক্ত, উপযুক্ত হবিঃ দ্বারা দেবগণের তৃপ্তি-সাধনকারী এবং বিধিপূর্বক সোমরস প্রস্তুতকারী যজমানের জন্য যজ্ঞফল রূপ ধনাদি আমিই বিধান করি। আমিই সমগ্র জগতের ঈশ্বরী, উপাসকগণের ধন প্রদাত্রী, পরব্রহ্মকে আত্মা হতে অভিন্ন রূপে সাক্ষাৎকারিণী। অতএব যজ্ঞার্হগণের মধ্যে আমিই সর্বশ্রেষ্ঠা। আমি প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে অবস্থিতা ও সর্বভূতে জীবরূপে প্রবিষ্টা। আমাকেই সকল দেবতা, মানুষ প্রমুখ যজমানরা বিবিধভাবে আরাধনা করেন। আমারই শক্তিতে সকলে আহার ও দর্শন করে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাদি নির্বাহ করে এবং উক্ত বিষয়ে শ্রবণ করে। যারা আমাকে অন্তর্যামিনীরূপে জানে না, তারাই জন্ম-মরণ ইত্যাদির ক্লেশ প্রাপ্ত হয় বা সংসারে হীন হয়। হে কীর্তিমান সখা, আমি তোমাকে শ্রদ্ধালভ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বলছি, তুমি তা শ্রবণ করো।

দেবগণ ও মনুষ্যগণের প্রার্থিত ব্রহ্মতত্ত্ব আমি স্বয়ং উপদেশ দিচ্ছি। আমি এইরূপ ব্রহ্মস্বরূপিণী। আমি যাকে যাকে ইচ্ছা তাকে তাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ করি। আমি কাউকে ব্রহ্মা করি, কাউকে ঋষি করি, আবার কাউকেও-বা অতি ব্রহ্মমেধাবান করি।

ব্রাহ্মণবিদ্বেষী হিংস্র-প্রকৃতি ত্রিপুরাসুর বধের জন্য রুদ্রের ধনুকে আমিই জ্যা সংযুক্ত করি। ভক্তজনের কল্যাণের জন্য আমিই যুদ্ধ করি এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে অন্তর্যমিনী রূপে আমিই প্রবেশ করেছি। আমিই সর্বাধার পরমাত্মার উপরে দ্যুলোককে প্রসব করেছি। বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে যে ব্রহ্মচৈতন্য সেখানেই আমার অধিষ্ঠান। আমিই ভূ-প্রকৃতি সমস্ত লোকে সকল জীবে ব্রহ্মরূপে বিবিধভাবে বিরাজ করছি। আমিই মায়াময় দেহ দ্বারা সমস্ত দ্যুলোক পরিব্যাপ্ত আছি। আমিই ভূ-প্রকৃতি সমস্ত লোকে সকল প্রাণী সৃষ্টি করে বায়ুর মতো স্বচ্ছন্দে তাঁদের অন্তরে-বাহিরে সর্বত্র বিচরণ করি। যদি স্বরূপত আমি এই আকাশের অতীত ও পৃথিবীর অতীত অসঙ্গব্রহ্মসৃবরূপিণী, তথাপি স্বীয় মহিমায় এই সমগ্র জগৎ-রূপ ধারণ করেছি।

সমূলক হোক, অমূলক হোক, বিদ্রোহের কোনো স্বীকৃত ব্যাকরণ নেই। বিদ্রোহ স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বতোৎসারিত। সর্বগ্রাসী ও সংক্রামক। প্রতিবাদই বড়ো কথা নয়। আসল কথা নিজেকে ভেতর ও বাহির থেকে মুক্ত করে আপন শক্তির মহিমায় অবলোকন করা। তারপর ব্যক্তির ও সমষ্টির জন্য সেই আত্মশক্তিকে ইতিবাচকভাবে প্রয়োগ করা। এইভাবে একটি সফল বিদ্রোহ সময়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কালক্রমে এমন একটি পদ্ধতিতে বিবর্তিত হয়ে যায় যা নিজেকে ও অন্যকে মানুষের সামগ্রিক প্রয়োজনে ইতিবাচক সক্রিয়তায় বিকশিত হওয়ার সুযোগ উন্মুক্ত করে। বিদ্রোহেরও শুরু আছে। এগিয়ে যাওয়া আছে। বিবর্তন আছে। আর পরিণতি আছে। প্রতিটি বিদ্রোহের পরিণতির পর আর একটি বিদ্রোহের জন্ম দেয়। যে বিদ্রোহের বীজকে ঋগ্বেদে অম্ভৃণকন্যা বাক্‌দেবী সঙ্গোপনে লালন-পালন করেছেন, কালক্রমে তার পরিণতি পায় বিদ্রোহী কবি কাজ নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতায়।

তথ্যসূত্র :

ঋগ্বেদের 'দেবীসূক্ত' এবং কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতা।

(লেখক সর্বভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা আকাদেমির অধ্যক্ষ)

(কাজি নজরুল ইসলামের জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

বিশ্বভারতী ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা পেলে তা হবে অত্যন্ত গর্বের বিষয়

মণীন্দ্রনাথ সাহা

খুবই আনন্দের বিষয়, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের একমাত্র সমকালীন ঐতিহ্যশালী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি দিতে চলেছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন ইউনেস্কো। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে এ নিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে বলে জানা গেছে। কবিপক্ষে বিশ্বভারতীর এই স্বীকৃতি প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লিখেছেন—'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম-জয়ন্তীতে ভারতের জন্য সুখবর। পশ্চিমবঙ্গে শান্তিনিকেতনের নাম ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকায় নথিভুক্ত করার সুপারিশ করেছে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টারের উপদেষ্টা বিভাগ আইকোমস।' ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সৌদি আরবের রিয়াধে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির বৈঠক রয়েছে। সেখান থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্বীকৃতি প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করা হবে।

রবিঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতন বাঙ্গালির কাছে তীর্থস্বরূপ। সেই তীর্থের যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ১৮৬৩ সালে রায়পুরের জমিদারের কাছ থেকে ভুবনডাঙ্গার মাঠের কাছে ২০ বিঘা জমি কিনে নেন। ১৮৬৪ সালে তিনি এখানে একটি একতলা দালানবাড়ি তৈরি করে তার নাম দেন 'শান্তিনিকেতন'। ১৮৮৮ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি ট্রাস্ট ডিড তৈরি করে শান্তিনিকেতন আশ্রমটিকে সর্বসাধারণের জন্য উৎসর্গ করে যান।

> অমর্ত্যবাবু আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং কোনোদিনই শান্তিনিকেতনে বাকি জীবন তিনি বসবাস করে কাটাবেন না বা তাঁর কোনো উত্তরসুরিও এখানে বসবাস করতে আসবেন না। তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র ১৩ শতক জমির ওপর তাঁর এত লোভ কেন?

১৯০১ সালের ২২ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ পাঁচজন ছাত্র নিয়ে শান্তিনিকেতনে স্থাপন করলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়। সেখানে তিনি প্রাকৃতিক পরিবেশে লেখাপড়া শেখাতে চাইলেন ছাত্রদের। তাঁর পরীক্ষা সার্থক হলো। ধীরে ধীরে এই বিদ্যালয় শাখাপ্রশাখা মেলে মহীরূহ হয়ে উঠল। ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হলো 'বিশ্বভারতী' সোসাইটি। জাতীয়স্তরে পরিচিতি লাভ করায় ১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদালাভ করে বিশ্বভারতী।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে জড়িয়ে আছে বহু বিশ্ববিখ্যাত মানুষের স্মৃতি। এখানে এসেছেন—মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মতো ব্যক্তিত্বরা। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য প্রাক্তনীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বরা

হলেন—প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, অস্কার বিজয়ী চিত্রপরিচালক সত্যজিৎ রায়, কোচবিহারের রাজকন্যা তথা জয়পুরের রানি গায়ত্রী দেবী, নোবেল স্মারক পুরস্কার জয়ী অমর্ত্য সেন এবং আরও অনেকে।

এহেন ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয়ও বঙ্গীয় রাজনীতির খপ্পরে পড়ে মাঝে মধ্যেই কালিমালিপ্ত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। যেমন—ইতিপূর্বে আদালতের নির্দেশে ২০২০ সালে পৌষমেলার মাঠে পাঁচিল দেওয়াকে কেন্দ্র করে ঘটে গেছে এক লজ্জাজনক অধ্যায়। সেই কলঙ্কিত অধ্যায়ে নাম জড়িয়েছিল শাসকদলের বিধায়ক থেকে স্থানীয় নেতাদের। জেসিবির মতো আধুনিক যন্ত্র দিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বিশ্বভারতীয় ঐতিহাসিক প্রবেশদ্বার। লোহার দরজার তালা ভেঙে শাসক দলের কর্মীরা লন্ডভন্ড করেছিল বিশ্বভারতীর দপ্তর যা টিভির দৌলতে প্রত্যক্ষ করেছিল গোটা বিশ্ব। দেশের গর্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই লজ্জাজনক আক্রমণ ও ধ্বংসলীলার ঘটনা সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত হতেই নিন্দার ঝড় উঠেছিল সমগ্র দেশ ছাড়াও বিশ্বজুড়ে। সমালোচনার মুখে পড়েছিল শাসকদলের।

এছাড়া অল্প কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে লিজ নেওয়া জমি থেকে অতিরিক্ত জমি অর্থনীতিবিদ নোবেল স্মারক পদকপ্রাপ্ত অমর্ত্য সেন দখল করে রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর সঙ্গে শ্রী সেনের মতবিরোধ দেখা দেয়। তাতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সশরীরে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে অমর্ত্য সেনের পাশে দাঁড়িয়েছেন। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি বর্তমানে আদালতের বিচারাধীন রয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, অমর্ত্য সেনের পিতা আশুতোষ সেন বহুবছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ১.২৫ একর জমি লিজ নেন। কিন্তু বর্তমানে জানা যাচ্ছে অমর্ত্য সেন বিশ্বভারতীর ১.৩৮ একর জমি দখলে রেখেছেন। অর্থাৎ লিজ দলিল মোতাবেক অতিরিক্ত ১৩ শতক জমি তিনি ভোগদখল করছেন। এঘটনা জানার পর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী ওই অতিরিক্ত ১৩ শতক জমি দখলমুক্ত করার জন্য অর্মত্য সেনকে বার্তা দেন। আর এনিয়েই শুরু হয়েছে চাপান উতোর। আরও জানা গেছে অমর্ত্য সেনের মতো আরও ৭০-৮০ জন প্রভাবশালী ব্যক্তি বিশ্বভারতীর জমি অবৈধভাবে দখল করে রেখে তাঁরা কলকাতা ও অন্যত্র বসবাস করছেন। অমর্ত সেনের দখল করা জমি যদি উপাচার্য উদ্ধার করতে পারেন তাহলে এই ৭০--৮০ জন প্রভাবশালীর দকল করা জমি উদ্ধারে যত্নবান হবেন বলে জানা গেছে।

সবচেয়ে মজার বিষয় হলো, আমাদের রাজ্যের তথাকথিত সুশীল সমাজ তথা বিদ্বজ্জনদের আচরণ ও নীরবতা। শাসকদল মদতপুষ্ট দুস্কৃতীরা যখন বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যপূর্ব প্রবেশদ্বার ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল তখন রাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা মুখে কুলুপ এঁটে ছিলেন। অথচ সেই বিশ্বভারতীর সম্পত্তি যখন অমর্ত্য সেনের কাছ থেকে উদ্ধার করার জন্য উপাচার্য সচেষ্ট হলেন তখনই এই বুদ্ধিজীবীরা একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তি অমর্ত্য সেনের পক্ষে কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে এসে ধরনায় বসে গেলেন। এঁদের চিন্তাধারা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখে বঙ্গের ঘোড়াগুলো এখন হাসছে কিনা আমার জানা নেই তবে সাধারণ মানুষ যে হাসাহাসি করছেন তা জানা গেছে।

অমর্ত্য সেন তাঁর মেধা, বুদ্ধি, দক্ষতা ও বিচক্ষণতার জন্য বিশ্বসভায় স্বীকৃত ও বন্দিত। অতুলনীয় সম্মানের অধিকারী তিনি। উপরন্তু তাঁর বর্তমান বয়স ৯০ বছর অতিক্রান্ত। তিনি শতবর্ষ অতিক্রম করেও বিশ্বকে আলোক বিতরণ করুন সেই কামনা করি। তিনি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের গর্ব, ভারতের গর্ব। কিন্তু যে কথাটা লিখতে অত্যন্ত সঙ্কোচ হচ্ছে তা হলো তিনি আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং কোনোদিনই শান্তিনিকেতনে বাকি জীবন তিনি বসবাস করে কাটাবেন না বা তাঁর কোনো উত্তরসুরিও এখানে বসবাস করতে আসবেন না। তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র ১৩ শতক জমির ওপর তাঁর এত লোভ কেন?

শান্তিনিকেতনের অজস্র দ্রষ্টব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রবীন্দ্রনাথের বাসগৃহ হিসেবে ব্যবহৃত ছটি বাড়ি—উত্তরায়ণ, উদয়ন, কোনার্ক, পুনশ্চ, উদীচী ও শ্যামলী। শান্তিনিকেতনের আরও এক অন্যতম দ্রষ্টব্য হলো 'বিচিত্রা' ভবন যা রবীন্দ্র অনুরাগী পাঠক ও গবেষকদের কাছে অমূল্য সম্পদ। এছাড়া আছে কলাভবন, সঙ্গীতভবন, বিদ্যাভবন, শিক্ষাভবন, বিনয়ভবন, চীনাভবন, হিন্দিভবন, পাঠভবন, সিংহ সদন, গ্রন্থাগার ও ছাতিমতলা।

বিশ্বভারতীর ইতিহাসে জড়িয়ে রয়েছে পৌষমেলাও। এই পৌষমেলায় অংশ নেওয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তো বটেই বিশ্বের অনেক দেশ থেকেও বহু ভ্রমণপিপাসু মানুষ এসে আনন্দ উপভোগ করেন। সে কারণে পৌষমেলা হয়ে উঠেছে বিশ্বমেলা। আমাদের এহেন গর্বের প্রতিষ্ঠানকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টারের' তকমা দেওয়া হবে শুনে বঙ্গবাসী তথা দেশবাসী আজ অত্যন্ত গর্বিত। □

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

বাঁকুড়ায় মধ্যবঙ্গ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ

সংবাদদাতা॥ এই বছর মধ্যবঙ্গে তিনটি স্থানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা শিবির চলছে। গত ১০ মে মধ্যবঙ্গ প্রান্তের শিক্ষার্থীদের ২০ দিন ব্যাপী প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ বাঁকুড়ার সত্যনারায়ণ অ্যাকাডেমি উচ্চ বিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সত্যনারায়ণ দত্ত এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি নিবন্ধক ড. তরুণ মজুমদার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের অখিল ভারতীয়-সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈত চরণ দত্ত কার্যকর্তা নির্মাণে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের গুরুত্বের বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করেন। এই সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে শিক্ষার্থী হিসেবে ১১৮ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত হয়েছেন। শিক্ষক ও ব্যবস্থাপক হিসেবে শিবিরে আরও ৫০ জন কার্যকর্তা যোগদান করেছেন। এছাড়াও আরও দুটি স্থানে মধ্যবঙ্গের প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ শুরু হয়েছে। গত ৮ মে বহরমপুরের কাশিমবাজার সরস্বতী শিশু মন্দিরে সঙ্ঘ শিক্ষা শিবিরের শুভ সূচনা করেন মধ্যবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস। এই বর্গে ১১২ জন উপার্জনশীল শিক্ষার্থী প্রথম বর্ষের জন্য যোগদান করেছেন। এছাড়া মেদিনীপুরের গোপালীতে চল্লিশোর্ধ্বদের একটি বিশেষ শিক্ষা বর্গ চলছে। এখানে মধ্যবঙ্গের ৮৫ জন শিক্ষার্থী শিবিরে অংশগ্রহণ করেছেন। এই বছর পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২১ জন শিক্ষার্থী তৃতীয় বর্ষের জন্য নাগপুরে সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গে যোগদান করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন যোজনা :

অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার॥ ভারত সরকার অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের স্বাবলম্বী করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কোটি কোটি শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তার মধ্যেই দেশের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হবে। এই কারণেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন যোজনা'র সূচনা করেছিলেন। এই যোজনার লক্ষ্য হলো অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের বৃদ্ধ বয়সে আর্থিক সংকট থেকে রক্ষা করা এবং তাঁদের পেনশন দেওয়া। মাসে ১৫ হাজার টাকার কম অর্থ আয় করেন এমন শ্রমিকরা খুব কম পরিমাণ মাসিক অর্থ প্রদানের মাধ্যমে ৬০ বছর বয়সে ৩০০০ টাকা মাসিক পেনশন পেতে সক্ষম হবেন। এই স্কিমটি অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের আর্থিকভাবে সক্ষম করছে শুধু নয়, বরং তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করছে।

এস জালান অ্যান্ড কোং-এর ম্যানেজিং পার্টনার সৌরভ ঘোষ সংবর্ধিত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এস জালান অ্যান্ড কোম্পানির ম্যানেজিং পার্টনার সৌরভ ঘোষ ও সেই সঙ্গে সম্রাট সেনগুপ্ত-র পরিচালনায় সম্প্রতি কোম্পানি এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। শ্রী ঘোষ কোম্পানির কাজকে দিল্লি ও মুম্বাই-সহ সারা দেশে বিস্তৃত করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে কোম্পানির অ্যাসেসিয়েট ও ইকুইটি পার্টনারদের একটি সংগঠিত 'টিম' কাজ করছে। কোম্পানির পক্ষ থেকে তিনি দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং, সিঙ্গাপুর ও ভিয়েনায় কমার্শিয়াল আরবিট্রেসান সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। 'ফোরবস (Forbes)' ম্যাগাজিন সম্প্রতি ভারতের শীর্ষ ম্যানেজিং পার্টনারদের তালিকায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করেছে।

আইনি ব্যবসায় সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ সিঙ্গাপুর থেকে সৌরভবাবু 'Lex Talcom Award' লাভ করেছেন। উল্লেখ্য, স্বস্তিকার ৭৫ বর্ষ উৎসব সমিতির তিনি সভাপতি।

মাতৃত্ব বন্দনা যোজনায় আরও সহজ মাতৃত্বের দিনগুলি

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ॥ এই যোজনায় গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মহিলাদের দুটি কিস্তিতে ৫০০০ টাকার নগদ প্রণোদনা দেওয়া হয়। এই অর্থ সরাসরি তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়। এছাড়াও, দ্বিতীয় সন্তানের জন্য স্কিমটি আরও প্রসারিত করে ৬০০০ টাকার সুবিধা প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় সন্তান মেয়ে হলেই এই সুবিধা দেওয়া হয়। প্রাক-জন্ম লিঙ্গ নির্ধারণকে নিরুৎসাহিত করার জন্য এটি করা হয়।

কেন্দ্রের কৃষিনীতির ফলে সুরক্ষিত প্রান্তিক চাষিরা

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ॥ দেশের কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করতে এবং তাঁদের ক্ষুদ্র কৃষির চাহিদা মেটাতে, কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্প কৃষকদের মহাজনদের কবল থেকে মুক্তই করেনি স্বনির্ভর করতেও কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত ১০০ শতাংশ কিষাণ সম্মান নিধি কৃষকদের জীবনকে সহজ করেছে।

- ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে ত্রয়োদশতম কিস্তি হিসেবে ১৬,৮০০ কোটি টাকা কৃষক পরিবারের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছিল।
- ভারতে ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ ক্ষুদ্র কৃষক রয়েছেন। সরকারের অগ্রাধিকার হলো এই কৃষকদের জীবন সুরক্ষিত করা।
- এখনও পর্যন্ত প্রায় ১১.৫ কোটি কৃষকের অ্যাকাউন্টে ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা পাঠানো হয়েছে, যার মধ্যে ৫০ কোটিরও বেশি মহিলা কৃষকদের অ্যাকাউন্ট রয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে সফল কেন্দ্র সরকার

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার ॥ কোভিড-১৯ মহামারির কারণে যখন দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত পরিবারগুলি অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল, তখন তাঁদের

সাহায্য করার জন্য প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা চালু করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা আইনে ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিনামূল্যে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছিল। এই প্রকল্পে আনুমানিক ৮০ কোটি সুবিধাভোগী ছিলেন। অন্তবর্তী সময়ে চাল এবং গম ছাড়াও, ডাল, ছোলা এবং সাবান দেওয়া হয়েছিল। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এই স্কিমের প্রশংসা করে বলেছে যে এটি মহামারী চলাকালীন সমাজের দুর্বল অংশগুলিকে মৌলিক পরিষেবা প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনের অধীনে ১ জানুয়ারি, ২০২৩ থেকে এক বছরের জন্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পরিবার এবং অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার সুবিধাভোগীদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করা হচ্ছে।

- সাতটি পর্যায়ে ১১২১ মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।
- কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৩ সালে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণে ২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি অর্থ ব্যয় করবে।

উজ্জ্বলায় মেয়েদের ধোঁয়া থেকে মুক্তি

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার॥ রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া উধাও হয়েছে। কিন্তু কোনও জাদুমন্ত্রে তা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার সাহায্যে তা সম্ভব হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের ফুসফুসকে সুস্থ রেখেছে। এটি বনে কাঠ কাটতে যাওয়ার মতো কাজের অবসান করে সময়ের সাশ্রয় করেছে। এটি শুধুমাত্র উজ্জ্বলা যোজনা নয়, এ যেন এক উত্তম জীবনের দিশা।

- স্কিম চালু হয়েছে : ১ মে, ২০১৬।
- ১৯৫৫ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত দেশে মাত্র ১৩ কোটি গ্যাসের সংযোগ ছিল।
- সক্রিয় গ্যাস সংযোগ রয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি, অর্থাৎ ৩০ কোটিরও বেশি হয়েছে।
- ২০১৬ সালের আগে গ্যাসের সংযোগের পরিধি ছিল ৬২ শতাংশ, ২০২২ সালের জানুয়ারিতে এটি ১০৪.১ শতাংশে পৌঁছেছে।

ফসল বিমায় কৃষকদের আস্থা বৃদ্ধি

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার॥ কৃষকরা সারা বছর মাঠে পরিশ্রম করেন। তাঁরা কষ্ট করে ফসল উৎপাদন করেন, কিন্তু অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ক্ষতি হয়। তখন কৃষকরা যে শুধুমাত্র দেনার জালে জড়িয়ে পড়েন তাই নয়, অনেক কৃষক আত্মহত্যার পথও বেছে নেন। এই ধরনের বিপর্যয় থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা চালু করেছে। কৃষকরা এর সুফল পেয়েছেন ব্যাপকভাবে। এখন বিপর্যয় থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য বীজ থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত বিমা করা হয়েছে। সরকারের এই পদক্ষেপ কৃষকদের আত্মবিশ্বাসই শুধু বৃদ্ধি করেনি, তাঁদের মধ্যে এই আস্থাও জাগিয়েছে যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেও তাঁদের আর মহাজনদের খপ্পরে পড়তে হবে না।

- প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে চালু হয়েছিল।
- ২০১৮ সালের পরে, ১১.৪২ কোটি কৃষক ফসল বিমা প্রকল্পে নিবন্ধন করেছিলেন।

জনধনে জনকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক উদ্যোগ

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার॥ অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রথম ভিত্তি হলো একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। কিন্তু ২০১১ সালে ২৪.৬৭ কোটি পরিবারের মধ্যে মাত্র ১৪.৪৮ কোটির কাছে ব্যাংকিং সুবিধা ছিল। ২০১৪ সালে ২৮ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা চালু করা হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল, যে সমস্ত নাগরিকদের ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট নেই তাঁদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা। বর্তমানে, ৮০ শতাংশ নাগরিককের একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং আর্থিক পরিষেবাগুলিতে সাধারণ মানুষের সুবিধা বৃদ্ধিতে জনধন প্রকল্পের প্রশংসা করেছে।

- প্রথম বছরে প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনাতে ১৭.৯০ কোটি অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল; এখন মোট অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ৪৮ কোটি অতিক্রম করেছে। এটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ব্রিটেন যুক্তরাজ্যের সম্মিলিত জনসংখ্যার চেয়ে বেশি।
- ২০১৫ সালের মার্চ মাসে ১৪.৭২ কোটি জনধন অ্যাকাউন্ট ছিল, যা প্রায় তিনগুণ হয়েছে।
- জনধন অ্যাকাউন্টধারীদের মধ্যে ৫৬ শতাংশ (২৬ কোটি) মহিলা।
- করোনার মতো কঠিন এবং অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে দেশের কন্যাদের আর্থিক ভাবে ক্ষমতায়নে পিএম আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী মাতৃত্ব বন্দনা যোজনা এবং উজ্জ্বলা-সহ সমস্ত প্রকল্পগুলি ব্যাপক সুবিধা প্রদান করেছে।

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ৪৫।।

১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে ভারতে ফিরে এলেন মহানামব্রতজী। গুরু মহেন্দ্রজীর আদেশে রেল স্টেশন থেকে দণ্ডী কেটে শ্রীঅঙ্গনে এলেন তিনি। গুরু শিষ্যের মিলন হলো।

বাংলাদেশের সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক তাঁকে নিজের গ্রামে প্রতিষ্ঠিত কলেজে অধ্যক্ষ হবার অনুরোধ জানালেন। মহানামব্রতজী রাজি হলেন না। তাঁর কাজ আরও অনেক বড়ো। তাঁর নিজের কথায় 'সবাই সবারে বাসবে ভালো রবে না অহংকার। হরিকথায় প্রাণ শীতল তৃপ্তি সবাকার।'

(ক্রমশ)